স্বামী সারদানন্দ

তৃতীয় সংস্করণ

উদ্বোধন কার্য্যালয়
কলিকাতা

 দুই টাকা

নিবেদন

স্বামী সারদানন্দ এ মরধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ভাব-সম্পদে আমাদের উত্তরাধিকারী করিয়া গেলেন এই গ্রন্থ তাহারই নিদর্শন। যুগাবতার রামকৃষ্ণের আগমনের সহিত যে নব ভাব-সমন্বয় উত্থিত হয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যাচ্ছলে, তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্য দিয়া, স্বামী সারদানন্দ ঐ ভাবেরই বিশিষ্ট রূপ প্রদান করিয়াছেন। দার্শনিকতার মধ্য দিয়া গীতায় সমন্বয় আছে, কিন্তু সমগ্র মহাভারতে "যত মত তত পথ"-রূপ সমন্বয়-সাধনার প্রত্যক্ষ সাধক-মূর্ত্তি না থাকায়, বাস্তব জীবনে উহার প্রয়োগের প্রকৃষ্ট অনুভূতির অভাবে, মহা-সমন্বয় গ্রন্থ শ্রীশ্রীগীতাও বিভিন্ন আচার্য্যের লেখনী-পরতন্ত্র হইয়া একদেশিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ভাব-দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্যই গীতা-ভাব-ঘন-মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীভগবানের পুনরাগমন এবং তাঁহারই শিষ্য তাঁহার অপূর্ব্ব দেবজীবনের মধ্য দিয়া গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া মনের সকল সংকীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা পরিহার-পূর্ব্বক সকল মানবকে বীর্য্য ও বলসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আশা করি জনসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিবেন।

স্বামী সারদানন্দ এই বক্তৃতাগুলি, ১৩০৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া, কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি ও রামকৃষ্ণ মিশন সভা এবং বালি ও কোন্নগর হরিসভায় প্রদান করেন। উহা প্রবন্ধাকারে উদ্বোধনে নিবদ্ধ ছিল, অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

জন্মাষ্টমী
১৩৩৫

প্রকাশক

সূচী-পত্র

বিষয়	স্থান	পৃষ্ঠা

স্বামী সারদানন্দ

গীতাতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

পরিচয়

(২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সালে কলিকাতা
বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত
বক্তৃতার সারাংশ)

গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যা আছে, আজ সেই বিষয়ে বল্‌ব। আমরা সকলেই জানি, আমাদের দেশে গীতার কত আদর, কারণ, হিন্দুধর্ম্মের সার কথা গীতায় আছে। গীতামাহাত্ম্যে এই বিষয়ে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

উপনিষদ্ সকল যেন গাভীস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ তার দুধ দুইছেন, অর্জ্জুন সেই গাভীর বাছুরের মত হয়েছেন। বাছুর যেমন গাভীর কাছে না গেলে গাভী দুধ দেয় না, সেই রকম অর্জ্জুনের প্রশ্নেই শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রোপদেশ এবং গীতারূপ দুধের উৎপত্তি। এই দুধ পান করবে

হয়ে থাকে এবং গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ। গীতামাহাত্ম্যে গীতাপাঠের বিশেষ ফল লিখিত আছে। একটি শ্লোকার্দ্ধ বলছি—

"গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।"

'যে নিয়ত গীতা পাঠ করে, সে পর জন্মে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।' অন্য কোন হীনযোনিতে তার জন্ম হয় না। এটি বড় সহজ কথা নয়। মনুষ্যত্ব লাভ করা বড়ই কঠিন। যার মনুষ্যত্ব আছে, তার জ্ঞান বল, ভক্তি বল, অপর কোন বিষয় বল, লাভ করতে কতক্ষণ লাগে? শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥"

জগতে এই তিনটি জিনিষ এক সঙ্গে পাওয়া দেবতার অনুগ্রহ না থাকলে হয় না। যথা, ১ম— মনুষ্যত্ব, ২য়—মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্ত হবার ই[illegible]। শরীরের সুখ, মনের সুখ না চেয়ে একটা উচ্চ উদ্দেশ্য স্থির ভাবে জীবনে রাখা। স্থির, অবিচলিত একটা উদ্দেশ্য থাকলে ক্রমে তা ভগবানের দিকে নিশ্চিত নিয়ে যাবে। সাধারণ লোকে আত্মসুখ নিয়েই ব্যস্ত। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য জীবনে রেখে চলে কে? ৩য়— মহাপুরুষসংশ্রয়। যে পুরুষ আপন জীবন সুমহৎ

উদ্দেশ্যে গঠন করেছেন, -এমন পুরুষের সঙ্গলাভ করা এবং তাঁর মুখ হতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য শোনা। তা এত দুর্লভ কেন? ধর্ম্মকথা, সৎকথা, তোমরাও বল্‌ছ, আমিও বল্‌ছি। কিন্তু তার দ্বারা কোন কাজ হয় না কেন? আমাদের কথার জোর নেই। কারণ, তা প্রাণের কথা নয়। আমাদের মন মুখ এক নয়। আমরা সংসারের সুখের জন্য লালায়িত, অথচ মুখে ত্যাগের কথা বলি। আমাদের কথায় কাজ হবেই বা কেন? যে পুরুষ আপনার জীবন মহৎ উদ্দেশ্যে গঠন করেছেন, মন মুখ এক করেছেন, তাঁর প্রতি কথায় যেন ভিতরের একটা দোর খুলে দেয়, মোহের আবরণ কাটিয়ে দেয়। মহাপুরুষদের কথায় বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে। পরমহংসদেবের কথায় কত শক্তি! ক্রাইষ্ট বা বুদ্ধদেবের সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন কথা পড়, এখনও সেই কথার কত শক্তি! কিন্তু তুমি আমি সেই কথা বল্‌লেও কারও প্রাণে ঘা লাগ্‌বে না। আবার যেই তুমি একটা মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন গঠন কর্‌বে, অমনি তোমারও কথার শক্তি বাড়্‌বে। তখন একটা কথা বল্‌লে লোকের প্রাণে লাগ্‌বে। যে জিনিষেরই শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর্‌বে, সেইটেরই শক্তি বাড়্‌বে। মনের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর, মানসিক শক্তি

বাড়্‌বে; সেইরূপ বাক্যের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর, কোন বিষয় বিশেষরূপে বল্‌বার ক্ষমতা বাড়্‌বে। বেদান্ত বলেন, এই মনই জগতের সৃষ্টি করেছেন। মনের অদ্ভুত শক্তি। ইউরোপের জড়বাদীরাও এ কথা স্বীকার করেন। ইতিহাস পাঠেও মনের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী দেশের রাণী মেরী এণ্টইনেট অপূর্ব্ব রূপসী ছিলেন। তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে পারি নগরের লোকেরা একদিন খেপে উঠে জেলে পুরে দিলে। পরদিন প্রাণ দণ্ড কর্‌বে স্থির করলে। প্রাতঃকালে দেখা গেল, রাণীর মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে। একরাত্রের দারুণ ভাবনায় তিনি একেবারে বুড়ী হয়ে গেছেন। মনের এতদূর ক্ষমতা! মন যদি তীব্র ভাবে একটা জিনিষ চায়, তা হলে তা নিশ্চয়ই পাবে। আমরা সম্পূর্ণ মনের সহিত কোন জিনিষ চাইতে পারি না, তাই তা পাই না। আমাদের মন, পরমহংসদেব যেমন বলতেন, সর্‌ষের পুঁটুলির মত। সর্‌ষের পুঁটুলি খুলে গিয়ে দানাগুলি যদি একবার ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে সেই সকলগুলিকে আবার একত্র করা অসম্ভব। ঘরের আস্‌বাবের কোণে, দেয়ালের ফাটালে এমন গিয়ে পড়্‌বে যে, হাজার চেষ্টা করলেও আর সকল দানাগুলি পাওয়া যাবে না। মনও

সেইরূপ একবার কতক রূপে, কতক রসে, কতক ধন মান ইত্যাদি সাংসারিক বিষয়ে ছড়িয়ে পড়লে আর তাকে সম্পূর্ণরূপে একত্র করা অসম্ভব। তাই পরমহংসদেব ছেলেদের এত ভালবাসতেন। কারণ, তাদের মন এক জায়গায় আছে। সত্যের বীজ ঐ সব মনে দিলে শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হবে।

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়কে এক একটি যোগ নাম-দেওয়া হয়েছে। যোগ অর্থ এক করে দেওয়া—ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়া। যথা, ১ম অধ্যায়কে বিষাদযোগ বলে। বিষাদযোগ কেন বলা হল? কারণ, অর্জ্জুনের বিষাদই তাঁকে ভগবানে নিয়ে যাবার উপায় হল। তাই বিষাদযোগ। এইরূপ সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদি।

আমরা বল্‌তে পারি, গীতা কেবল অর্জ্জুনের জন্যে বলা হয়েছিল। তাতে আমাদের কি হবে? আমরা ত আর যুদ্ধে যাচ্ছি না, অথবা মহাবীর অর্জ্জুনের জীবনের সঙ্গে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের জীবনের কোন অংশে সাদৃশ্যও নেই। অতএব মহৎ অধিকারীর উদ্দেশে উপদিষ্ট শাস্ত্র আমাদের উপকারে কিরূপে লাগ্‌বে? উত্তরে বলা যেতে পারে, অর্জ্জুন আমাদের চাইতে শতগুণে বড় হলেও মানুষ ছিলেন। আমরাও মানুষ।

তাঁর জীবনে যেমন মোহ কখন কখন হয়েছিল, আমাদেরও তেমনি মোহ প্রতিপদে হয়, আমাদেরও তাঁর মত সত্যের জন্যে নানা বিঘ্নবাধার বিপক্ষে দাঁড়াতে হয়। আমাদেরও তাঁর মত ভেতরে বাইরে জীবন-সংগ্রাম চলেছে। তাই আমরাও গীতা পড়্‌লে শিক্ষা পাই, শান্তি পাই, জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব্ব সমাধান পাই। দেখা গিয়েছে, কত পাপী তাপীর গীতা পাঠ করে অনুতাপের অশ্রু পড়েছে এবং উচ্চ দিকে জীবনপ্রবাহ চালিত হয়েছে।

আর এক কথা। গীতা কি মহাভারতাঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে? কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বল্‌ছেন, গীতা প্রক্ষিপ্ত। আমাদের দেশেও অনেক লোক তাই শুন্‌ছে। তাঁরা বলেন, ভারতবর্ষের পুরাকালের কোন ইতিহাস নেই, কখন ছিলও না। অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যে, ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড দর্শন সংগ্রহ বাস্তবিক উপদিষ্ট হয়েছিল, এ কথা একেবারে যুক্তিবিরুদ্ধ। একটা বিষয় বিশ্বাস করবার আগে তা সম্ভব বা অসম্ভব, বুঝ্‌তে ত হবে? তার উত্তর এই যে, আগে ভারতবর্ষের মত পুরাতন তাঁদের দেশ হোক, তখন দেখা যাবে, তাঁদেরও কত ইতিহাস থাকে। ভারত কত দিনের। কত বিপ্লব হয়ে গেছে। কতবার সব ভেঙ্গে

গেছে, আবার কতবার সব গড়েছে। ইউরোপ তার কি জান্‌বে? ইউরোপ ত সে দিনের। এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কত যুগ পূর্ব্বে ভারত হতে সময়ে সময়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ হয়েছিল, ইউরোপে এখন সেই সব প্রকাশ হচ্ছে! এতেই বোঝা যায়, ভারতবর্ষ এক সময়ে কত উচ্চে উঠেছিল। এই ভারতের ন্যায় উদারতা কোথায় ছিল? আমাদের নীতিশাস্ত্র বলেন, সত্য চণ্ডালের নিকটেও শিক্ষা করবে, কারণ, জ্ঞানই ভগবান, অতএব পবিত্র। যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই ঋষিত্ব। সেখান থেকেই সেই জ্ঞান নেবে। গীতাও বলেন—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

'জ্ঞান সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে।'

একবার সেই জ্ঞান এলে আর কিছুই কু থাকে না। পরমহংসদেব বল্‌তেন, একবার যে মিছ্‌রি খেয়েছে, তার কাছে কি আর চিটেগুড়ের আদর আছে?

তার পর ধর্ম্ম ও দর্শন ভারতের প্রাণস্বরূপ। আমাদের দেশের লোকের অস্থিতে মজ্জাতে, প্রতি কার্য্যেতে এই প্রাণপ্রতিঘাত এখনও পাওয়া যায়। তখন যুদ্ধোদ্যোগের পূর্ব্বে এরূপ শাস্ত্র যে উপদিষ্ট হতে পারে না, এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ যতক্ষণ না পাব, ততক্ষণ কেন আমাদের বহু পুরাতন জাতীয় বিশ্বাস

পরিত্যাগ করে তোমার কথা নেব? আবার গীতাবক্তা স্বয়ং ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ! তোমার আমার মত সাধারণ পুরুষের পক্ষে যে কাজ সম্ভবে না, তা তাঁর ন্যায় মহাপুরুষে নিশ্চিত সম্ভবে! এও বুঝ্তে হবে এবং মহাভারতের অন্যান্য অংশের ভাষার সঙ্গে গীতার ভাষার এমন কিছু বিষমতাও দেখ্তে পাই না, যাতে তোমার কথা নিতে পারি। যাঁরা সাধুসঙ্গ করেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন, সংসারে আমরা যাকে মহা মহা বিপদ্ বলি, সাধু তারই ভিতর অবিচলিত থেকে মহা তত্ত্বকথা সকল বলেন। এ আমাদের প্রত্যক্ষ। পরমহংসদেব ভয়ানক রোগে ভুগ্ছেন। ছমাস থেকে আহারাদি প্রায় বন্ধ। কিন্তু সমীপস্থ লোকের ভেতর মহা আনন্দের ব্যাপার চলেছে। অতি গূঢ়সাধন, জগতের কূটপ্রশ্ন সমূহের মীমাংসা এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদানে সকলকে মাতিয়ে রেখেছেন। রোগ, দুঃখ বা কষ্টের নাম মাত্রও নেই। অর্জ্জুন স্বয়ং ভগবানের কাছে রয়েছেন। জ্ঞানের কথা বোঝাতে তাঁর কতক্ষণই বা লেগেছিল? অতএব ইহা প্রক্ষিপ্ত নয়। যদি বল, ওসব ছাড়া গীতার একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, সেটি হচ্ছে এই, —সংসারক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই, খাবার সংগ্রহের লড়াই, এইরূপ কতই না সংগ্রাম মানুষকে দিন রাত

করতে হচ্ছে, বিরাম নেই, শান্তি নেই। এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে মানব কিরূপে জীবনের সার উদ্দেশ্য লাভ করবে, এই বিষয়ের বিশেষ সমাধান করাই গীতার ভাব। বেশ কথা, এরূপ বিশ্বাস করতে চাও, আপত্তি নেই।

পূর্ব্বে বলেছি, গীতাকে উপনিষদ্ মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। অনেকে স্নান করে প্রতিদিন অন্ততঃ এক অধ্যায়ও গীতা পড়েন। তাঁরা গীতার প্রত্যেক শ্লোককে মন্ত্রস্বরূপ পবিত্র মনে করেন। যেমন মন্ত্রের ঋষি, দেবতা, ছন্দাদি আছে, এরও সেই রকম আছে। গীতার ঋষি বেদব্যাস, কারণ, তিনিই মন্ত্র দর্শন করেছেন। (ঋষি শব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয়দর্শী।) তিনি দেখেছেন, তার পর সাধারণের জন্যে সেই বিষয়টা শ্লোকে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছেই মন্ত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, অতএব ঋষি শব্দের অর্থ ইংরাজীতে যাকে Author বলা হয়, তাই। প্রত্যেক মন্ত্রের যেমন ঋষি অর্থাৎ রচয়িতা, দেবতা অর্থাৎ যে বিশেষ বিষয় নিয়ে মন্ত্র রচিত হয়েছে, ছন্দ অর্থাৎ যেরূপ পদ-বিন্যাসে মন্ত্রের ভাষা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি বীজও থাকে, গীতারও আছে। বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, তেমনি গ্রন্থের মধ্যে এমন একটা বিষয়

থাকে, যেটা অবলম্বনে বা যেটাকে ফলিয়ে বাকিটা লেখা হয়। গীতার বীজ স্বরূপ সে বিষয়টি কি ?

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

অর্থাৎ 'যার জন্যে শোক করা উচিত নয়, তার জন্যে শোক করছ আবার পণ্ডিতের মত কথা বল্‌ছ।' এর অর্থ এই যে, তোমার মুখে এক, মনে আর এক এবং তুমি সরল নও। যার মুখে একখানা, মনে আর একখানা, তাকে ধাক্কা খেতে হবে। তার সত্য বা ভগবান লাভের ঢের দেরি। পরমহংসদেব বল্‌তেন, মন মুখ এক করতে হবে, উহাই প্রধান সাধন। গীতাও সেই কথা বল্‌ছেন। ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের বীজ সরলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তার পর যেমন প্রত্যেক মন্ত্রের শক্তি আছে, তেমনি গীতার বিশেষ শক্তি এই শ্লোকে নিবদ্ধ।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

'সব ছেড়ে দিয়ে আমার শরণাপন্ন হতে পার, সব হয়ে যাবে।' আমরা কত রকম Plan বা মতলব করে থাকি। এটা করব, ওটা করব। অনেক সময় কিন্তু সব যেন এক ঘায়ে ভেঙ্গে যায়, একটা মহাশক্তি যেন সব ভেঙ্গে দেয়! তার হাতের ভেতর যেন

রয়েছি, তার অনুমতিতে নড়্ছি চড়্ছি। তা বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, Free will বা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। মানুষ, স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টের মধ্যস্থলে পড়ে রয়েছে। যেন কেমন একটা আলো-আঁধার, একটা ঠিক করে বল্‌বার যো নেই, আলো বল আলো, আঁধার বল আঁধার। সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই মানুষ এই অতীন্দ্রিয় জিনিষটা জান্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। ইউরোপে সক্রেটিস থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই জগৎটা কি, কোন্ শক্তি অবলম্বনেই বা প্রকাশিত হয়ে রয়েছে, স্বাধীন বা পরাধীন ইত্যাদি বিষয় জান্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, কিন্তু কিছুই করে উঠ্‌তে পারেনি। কারণ, মনের দ্বারা ওবিষয়টা জানা যায় না, মনের সীমা আছে। অন্তবিশিষ্ট জিনিষ অনন্তকে কি করে জান্‌বে? ইন্দ্রিয়াদির পারে না গেলে যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, সে সকল প্রশ্নের সমাধান মন কেমন করে করবে? একটা গল্প আছে, একজন পণ্ডিত এই সকল তত্ত্ব বোঝ্‌বার ও বোঝাবার চেষ্টা অনেক দিন ধরে করেছিলেন। কিছুই না পেয়ে সমুদ্রে ডুবে মর্‌তে যান। সেখানে দেখেন, এক বালক অদ্ভুত খেলা খেল্‌ছে। সমুদ্রের কিনারায় বালিতে একটা গর্ত্ত খুঁড়েছে এবং ছোট ছোট হাতে সমুদ্র হতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল

এনে ঐ গর্ত্তটা পোরাবার চেষ্টা কর্‌ছে। অশেষ আয়াস এবং অনেকক্ষণ ছুটোছুটি চল্‌তে লাগ্‌ল। পণ্ডিতের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হল এবং বালক কি কর্‌ছে, সেই বিষয় জান্‌বার কৌতূহল হল। নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, বালক, একি কর্‌ছ? বালক বল্‌লে, সমুদ্রের সব জলটা এই গর্ত্তে আন্‌ছি। পণ্ডিত কথা শুনে না হেসে থাক্‌তে পার্‌লেন না, কিন্তু পরক্ষণেই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, মনের দ্বারা মনাতীত বস্তু ধর্‌বার প্রয়াস—আমারও কি এরূপ হচ্ছে না? বিবেকানন্দ স্বামিজী বল্‌তেন, 'আমরা যেন সব গজ নিয়ে বেরিয়েছি। ভগবানকে ছেঁটে ছুঁটে মেপে বের করে বুঝে নেব।' তা হয় না। মন জড়। আমাদের ঋষিরা জান্‌তেন,—মন সূক্ষ্ম জড়—এই স্থূল জড়টাকে চালাচ্ছে; কিন্তু ওর আপনার শক্তি নেই, আত্মার শক্তিতে শক্তিমান, তিনিই সব চালাচ্ছেন। ইউরোপের অনেকের বিশ্বাস, মনই আত্মা। তা নয়। গীতা বলেন, এ সকল প্রশ্ন সমাধান কর্‌বার আগে উপযুক্ত অধিকারী হতে হবে। কিরূপে তা হওয়া যায়? বিশ্ব-মনের বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে আপন ক্ষুদ্র মন ও ইচ্ছা এক-তানে যোগ করতে হবে। একটিতে যেমন ভাব, যেমন স্পন্দন হতে থাক্‌বে, অপরটিতেও সেইরূপ ভাব

ও স্পন্দন উত্থিত হবে। তবেই ক্ষুদ্র মনে বাসনাপ্রসূত জ্ঞানের বিঘ্নবাধাসকল দূরীভূত হয়ে বিশেষ শক্তি প্রকাশিত হবে। সেই জন্যেই গীতোক্ত ধর্ম্মের সমস্ত শক্তি এই শ্লোকে নিবদ্ধ।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

তিনি জগতের নিয়ন্তা। তাঁর যা ইচ্ছা, আমারও সেই ইচ্ছা হোক, আমি আর কিছু চাই না। এই ভাবটা যিনি মনে দৃঢ় রাখেন, তিনি এই মহাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলেন। তাঁরই অহঙ্কার দূর হয়, জ্ঞান আসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের ভেতর এর ঠিক বিপরীত ভাবই থাকে। বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে লড়ালড়ি করেই মরি কেবল বাসনার জন্যে। দেখ না, পরিবর্ত্তন হচ্ছে জগতের নিয়ম, তা সকলেই জানে, কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা হচ্ছে, যাতে অনিত্য শরীরটা চিরকাল থাকে। আমাদের ভালবাসাটাতেও কি এই ব্যাপার হয় না? যাকে ভালবাসি, তার শরীর মনটাকে ধরে রাখ্‌বার চেষ্টা। আমরা ভালবাসার পাত্রের অনিত্য শরীর মনকে আপনার করে চিরকাল রাখ্‌তে চাই। সেই জন্যে আমাদের ভালবাসায় মোহ হয়। নতুবা ঠিক ভালবাসা ভগবানের অংশ, তাতে মোহ আসে না।

প্রকৃত ভালবাসা হলে ভালবাসার পাত্রকে অনন্ত স্বাধীনতা দেয়, আমার করতে চায় না। এইরূপে মানুষ বাসনার বশীভূত হয়ে বিশ্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনিত্যকে নিত্যকাল ধরে রাখ্‌তে চায়। ইহা মনে রেখো। ঈসপের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এক গরিব বৃদ্ধ একদিন একটা কাঠের বোঝা মাথায় করে অতি কষ্টে যাচ্ছিল। একে গরমিকাল, তাতে বোঝাটা অত্যন্ত ভারী, বৃদ্ধেরও অল্প শক্তি, বৃদ্ধ কিছুদূর গিয়ে ঘর্ম্মাক্তদেহে শ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়্‌ল আর আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, মৃত্যুও কি আমায় ভুলেছে! বল্‌তে বল্‌তে বিকটাকার মৃত্যু এসে উপস্থিত, বৃদ্ধকে বল্‌লে, বৃদ্ধ, আমায় ডাকছিস্ কেন? বৃদ্ধের বাঁচবার ইচ্ছা প্রাণে প্রাণে। আম্‌তা আম্‌তা করে সভয়ে বল্‌লে, মহাশয়, বোঝাটি বড় ভারী। একলা তুল্‌তে পারছিলুম না। তাই তুলে দিতে আপনাকে ডেকেছি। আমাদেরও অনিত্য বিষয় ছাড়্‌তে ঠিক এইরূপ হয়।

গীতার আরম্ভটি বড় সুন্দর বলে বোধ হয়। দুই দল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, উভয় পক্ষে মহা মহা বীর রয়েছেন —সকলের এক এক শাঁক ছিল, শাঁকের আওয়াজে তখন যোদ্ধা চেনা যেত। চারিদিকে শাঁক বেজে

উঠ্‌ল। এমন সময় অর্জ্জুন বল্‌লেন, দুই দলের মাঝ-খানে আমার রথ রাখ, দেখি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কে? তখনও তাঁর মোহ আসে নি, সম্পূর্ণ সাহস ছিল। শ্রীকৃষ্ণ রথ রাখ্‌লেন। অর্জুন দেখ্‌লেন, বিপক্ষ দলে ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ ভীষ্ম এসেছেন; যাঁর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছেন সেই আচার্য্য দ্রোণ, অমর কৃপাচার্য্য, সমযোদ্ধা কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এসেছেন। কোন কোন টীকাকার বলেন, এই সব দেখে তাঁর একটু ভয় হয়েছিল। কারণ, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুবর ও পরশুরামকে যুদ্ধে জয়ের কথা, সিন্ধুরাজতনয় জয়দ্রথের উপর শিবের বিশেষ বরের কথা এবং কর্ণের পরাক্রমাদিও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এই জন্যে বিচিত্র নয়, তাঁর ভয় হয়েছিল। তাঁরা এ কথার প্রমাণ স্বরূপ আরও বলেন, গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেন, তখন বিশেষ করে দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণকে মৃত দেখেছিলেন। তাতেই অর্জুন সংগ্রামে নিজে জয়ী হবেন এবং জয়-পরাজয় প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা ও কাজের পিছনে কার শক্তি বিদ্যমান, তা বুঝ্‌তে পার্‌লেন। এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে। সমগ্র গীতাশাস্ত্র শুনে অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমরের ভীষণ হত্যাকাণ্ড নিশ্চিন্তমনে কর্‌লেন ও দেখ্‌লেন। এতে তাঁর

উপর অত্যাচার করা হ'লো। আজ স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় অন্যায়ের প্রতিকার কর্‌লে না, কাল তোমার উপর যখন অত্যাচার হবে, তখন তোমার আর প্রতিকার করবার সামর্থ্য থাকবে না। এইরূপে ধীরে ধীরে অবনতি এবং দাসত্বের পথে অগ্রসর হবে।

যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনেরও মোহ এল; বল্‌লেন, এ সুখের আর দরকার নেই। আত্মীয় স্বজনই যদি সব মরে গেল, ত রাজত্ব নিয়ে কর্‌ব কি। শ্রীকৃষ্ণ দেখ্‌লেন, অর্জ্জুন ভয়টুকু লুকুচ্ছেন আর আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলেছেন। মনে করেছেন, নিজের জন্যে লড়াই কর্‌তে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যে সত্যের জন্যে দাঁড়িয়েছেন, অন্যের উপর অত্যাচার প্রতিবিধান করতে, কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে দাঁড়িয়েছেন, তা ভুলেছেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বকরাক্ষস বধ ইত্যাদি স্থলে যেখানে যেখানে তাঁরা অন্যায় অবিচার দেখেছেন, সেখানেই ধর্ম্ম বোধে তার প্রতিবিধান করে এসেছেন। এখানে তা ভুলে গেছেন—মনে করেছেন, রাজ্য পাবার জন্যেই বুঝি যুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সংসারে আমরা অনেক সময় এরূপ দেখ্‌তে পাই, রূপের মোহে, কাঞ্চনের মোহে ব্যস্ত হয়ে উদ্দেশ্য হারিয়ে বসে থাকি। যদি সাধনা থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্য আবার ফিরে আসে বটে, তা না

হলে কেবল ছুটোছুটিই সার হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই দেখেই প্রথম দুটি শ্লোকে তাঁকে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে বল্‌ছেন—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

'হে অর্জ্জুন, এই সময়ে তোমার মোহ কোথা থেকে এল? তোমার মত শ্রেষ্ঠ লোকের স্বর্গের পথে বাধা দিতে এমন মোহ কেনই বা এল? হে অর্জ্জুন, এ ক্লীবতা ত্যাগ কর। এ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তোমার মতন শক্তিমান পুরুষে শোভা পায় না। দূর করে দিয়ে ওঠ, লড়াই কর।' ওই থেকে একটা বিশেষ উপদেশ আমরা পাই,—যেটা মোহ আনে, দুর্ব্বলতা আনে —সেইটাই মহাপাপ। মনের সম্বন্ধে যেমন, শরীরের সম্বন্ধেও তেমনি। শারীরিক দুর্ব্বলতা যাতে আনে, সেটা করাও পাপ। আজকাল ছেলেদের পাশের পড়ার ঝোঁকে শরীরের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না। এটা যে একটা পাপ, সে ধারণা আমাদের নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেলেরা বেরোবার পর আর তাদের শরীর বয় না। তারা হাত পার ব্যবহার একেবারে ভুলে যায়। ফল, অনেক কার্য্যে অক্ষমতা। শরীর

সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। না রাখ্‌লে দুর্ব্বলতা আনে। শরীর ও মনের সম্বন্ধে যা অত্যাচার কর্‌বে, তার ফল ভুগ্‌তে হবেই হবে।

অর্জ্জুন তার পর বল্‌ছেন, ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব কি করে? গুরু দ্রোণকে মার্‌ব কি করে? তার পরই দেখ্‌তে পেয়েছেন, মুখে যে ধর্ম্মভানটা কর্‌ছেন, মনে তা নেই (মন টের পায় কি না।) আর বল্‌ছেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং
ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং
শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

'আমার কার্পণ্য দোষ এসেছে, আমি দয়ার পাত্র হয়েছি। (কৃপণ শব্দ দয়ার পাত্র, এ অর্থে ব্যবহৃত হত।) মনের আঁট গেছে। সব গুলিয়ে গিয়ে একটা দয়ার পাত্র হয়েছি। তাই প্রার্থনা কর্‌ছি, অনুনয় কর্‌ছি, আমি তোমার শিষ্য, শিক্ষা দাও।' তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনে গোলমাল কোথা হতে হয়েছে, তাই ধরে বল্‌ছেন,—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

'তুমি পণ্ডিতের মত কথা বল্‌ছ, কিন্তু পণ্ডিত যে

জন্যে শোক করেন না, তুমি তারই জন্যে শোক করছ।' এই দুই কথায় অর্জ্জুনকে খুব ঘা দেওয়া হল। পণ্ডিতেরা কি বলেন? কোন্‌টা নিত্য? শরীর ত পরিবর্ত্তনশীল। পণ্ডিত লোক এই অনিত্য শরীরের জন্যে কখনই শোক করেন না। তুমি শোক কর্‌ছ। অতএব তোমার মন মুখ এক নয়, তুমি পণ্ডিত নও। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কয়টি কথায় ধর্ম্মরাজ্যের আবশ্যকীয় প্রধান দুটো জিনিষ দেখ্‌লুম। প্রথম, কোন-রূপ দুর্ব্বলতা আস্‌তে দেওয়া হবে না। তা হলে উদ্দেশ্য লাভ বহুদূর। দ্বিতীয়, মন মুখ এক করতে হবে। এই দুটো উপদেশ যদি জীবনে পালন করতে পারি, তা হলেই উন্নতির দ্বার মুক্ত হবে। যে যে পরিমাণে এই দুটো পালন করেছে, সে যেখানেই থাক্‌, সংসারে বা সংসারের বাইরে, সেই পরিমাণে যথার্থ কাজ তার দ্বারাই হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

(২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩ই ডিসেম্বরে কলিকাতা
বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত
বক্তৃতার সারাংশ)

গতবার আমরা দুটি কথা বিশেষরূপে শিখেছি। প্রথম দুর্ব্বলতা, শারীরিকই হোক, বা মানসিকই হোক, যা থেকে আসে, সে সমস্তই পাপ; অতএব তা একেবারে ত্যাগ কর্‌তে হবে। কারণ, সে সময়ে মানুষ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য প্রভৃতি সব ভুলে যায়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মন মুখ এক কর্‌তে হবে অর্থাৎ পণ্ডিতের মত কথা বলা অথচ কাজে অন্য রকম করা চল্‌বে না। পরমহংসদেব বল্‌তেন, মন মুখ এক করাই প্রধান সাধন। সকল স্থানে সব বিষয়েই এ সত্য। কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে, সব জায়গায় এর দরকার। অনেকে হয়ত বল্‌বেন যে, মন মুখ এক করে ধর্ম্ম কর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু সংসার

করা চলে না। কিন্তু সেটি ভুল। জগতের নানাবিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল মানুষ বেশ বুঝতে পার্‌ছে, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি ঘোর সাংসারিক বিষয়েও যে যত পরিমাণে উত্তম আন্‌তে পার্‌বে, যত পরিমাণে মন মুখ এক করে খাট্‌তে পার্‌বে, তত পরিমাণে তার উন্নতি।

গীতা সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা আবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা বলেছিলেন। সে কথা শুন্‌লেই বা কে, লিখ্‌লেই বা কে? যুদ্ধক্ষেত্রে ত ব্যাসও ছিলেন না, সঞ্জয়ও ছিলেন না, অথচ গীতা পাঠে দেখ্‌তে পাই, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুচর সঞ্জয় তাঁর প্রভুকে গীতা বল্‌ছেন আর মহর্ষি ব্যাস তা শ্লোকাকারে মহাভারতনিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা জান্‌লেন কি রকম করে? গল্প আছে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ জান্‌বার জন্যে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রার্থনা করায় ব্যাস তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁর বাসনা পূর্ণ কর্‌বার জন্যে ঐ যোগদৃষ্টি সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন। তাই সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের সব ব্যাপার দেখ্‌ছেন আর ধৃতরাষ্ট্রকে বল্‌ছেন।

আজকার বিষয় জ্ঞানযোগ। মানুষের যখন মোহ

আসে, তখন আত্মজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই তাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে না। যখন আত্মীয় স্বজন কেউ মরে যায়, বা জীবনপ্রবাহের একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তনরূপ আবর্ত্ত এসে উপস্থিত হয় আর ক্ষুদ্র মানুষের যত কিছু মতলব এক ঘায়ে সব ভেঙ্গে দেয়, সেই শোকের সময় আত্মজ্ঞান যদি কারও থাকে, তবেই সে ঠিক থাক্‌তে পারে। এইরূপ পরিবর্ত্তন সকলেরই জীবনে কখন না কখন এসেছে বা আস্‌বে। অর্জ্জুনের জীবনে এই মহাসমর সেই পরিবর্ত্তন এনেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে আত্মজ্ঞান সহায়ে বীরাগ্রণী অর্জ্জুন জীবনের এই মহা সন্ধিস্থল সহজে উত্তীর্ণ হয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কত লোকই না ঐরূপ স্থলে আশার আলোক না দেখ্‌তে পেয়ে পথহারা হয়ে অবনতি ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে! সে জন্যে গীতার প্রথমেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ। অর্জ্জুনের প্রতিও বটে, আর সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সকল মানবের প্রতিও বটে। এই জন্যে পরমহংসদেবও শিক্ষা দিতেন, 'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।' সংসারের মধ্যে সব পরিবর্ত্তনশীল। জড়রাজ্যের অন্তর্ভূত সকলেই এই নিয়মের অধীন। কোথায় যাচ্ছে কি উদ্দেশ্যে, কে বল্‌তে পারে? পরিণামবাদীরা (Evolutionists)

বলেন, ক্রমোন্নতি হচ্ছে; হবার উদ্দেশ্য কি, তা বল্‌তে পারেন না। বীজ থেকে গাছ, ফুল, ফল হচ্ছে; এর উদ্দেশ্য কি? কিসের জন্য এ খেলা? মানুষের মনে সর্ব্বযুগে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন উদয় হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর পায় নাই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা বলেন, এর উদ্দেশ্য এক অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুসম্পন্ন সমাজ-শরীর গঠন করা। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এই যে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের শৃঙ্খলরূপ বিচিত্র জগৎকার্য্য চলেছে, এ অনাদি। এই যে ব্যাপার, এ ভগবানের দিক্ থেকে দেখ্‌লে উদ্দেশ্যবিহীন লীলা বিলাস বা খেলা মাত্র বোধ হয়, কারণ, বিশ্বসৃজনে ভগবানের কোন এক উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা আছে বল্‌লে তাঁতে অপূর্ণতা দোষ উপস্থিত হয়। তাই শাস্ত্রকারেরা বলেন, সৃষ্টি তাঁর খেলামাত্র। তিনি যে সৃষ্টি করে বড় হলেন বা ছোট হলেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের দিক্ থেকে দেখ্‌লে অর্থাৎ মানুষ এ জগতে এসে নানা চেষ্টা কেন কর্‌ছে, এ কথা ভাব্‌লে উদ্দেশ্য এই বোধ হয়, সংসারবন্ধন কেটে আত্মজ্ঞান লাভ করা, পূর্ণত্ব লাভ করে সমস্ত দুঃখ কষ্টের হাত অতিক্রম করা। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা যায় যে, ঐরূপ ইন্দ্রিয়জিৎ, আত্মজ্ঞানী, সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত মনুষ্যসমাজ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হবে অর্থাৎ সে

সমাজে সকল অঙ্গের মনের ভিতরের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ায় সদা শান্তি ও আনন্দ বর্ত্তমান থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখ্‌লেন, অর্জ্জুনের এ মোহ, আত্মজ্ঞান ভিন্ন যাবার নয়, তখন তিনি বল্‌লেন—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।"

তুমি, আমি যে কখন ছিলাম না বা থাক্‌ব না, তা নয়। আত্মা অজর, অমর। এই শরীর জড়। যে জিনিষ জড় হতে উৎপন্ন, তাকে জড়ের নিয়মে থাক্‌তে হবে। যা সূক্ষ্ম জড় অর্থাৎ মন হতে প্রসূত, তা সূক্ষ্মের নিয়মে চল্‌বে। যা জড় হতে উদ্ভূত, তাকে নিত্যকাল ধরে রাখ্‌বার চেষ্টা বৃথা। জড়ের নিয়ম পরিবর্ত্তনশীলতা। তাকে পরিবর্ত্তিত হতে দেব না, এক ভাবে চিরকাল রাখ্‌ব, এ চেষ্টা মূর্খের কাজ, অজ্ঞানের কাজ। সংসারে এ চেষ্টা প্রতিনিয়ত হচ্ছে। কোন সময়ে যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, জগতে আশ্চর্য্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

রোজ রোজ লোক মর্‌ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি। সংসারের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, একজনকে-না-একজনকে মর্‌তে দেখেনি। তবু সকলেই এমন ভাবে কাজ কর্‌ছে,

যেন সে অমর। সকলের ভেতরেই এই জড় শরীরকে চিরকাল ধরে রাখ্‌বার বাঞ্ছা।

জড়ের ষড়্‌বিকার আছে। জন্ম, কিছুকাল অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি বা সুপক্কাবস্থা, ক্ষয় বা হ্রাস ও বিনাশ, এই ছয় অবস্থাভেদ। শাস্ত্র বলেন, মনও সূক্ষ্ম জড় হতে তৈরী। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, Mind, Spirit, Soul সব একই জিনিষ। আমাদের দেশে চার্ব্বাকের মতও তাই! মন বা আত্মা মস্তিষ্কের কার্য্য মাত্র। মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে এর উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে। কোন কোন পরিণামবাদী পণ্ডিত বলেন, মনটা মস্তিষ্কের কার্য্যমাত্র নয়, ও এক স্বতন্ত্র পদার্থ—ঐ সর্ব্বদা 'আমি', 'আমি' করছে, এবং ঐ আত্মা। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি, মানসিক শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি আছে। মনও জড়ের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল—এ কিরূপে আত্মা হবে? অতএব শাস্ত্রকারেরা বলেন, আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ। শরীরের দ্বারা যেমন মনের দ্বারাও তেমনি কাজ করাচ্ছেন বা চালাচ্ছেন। প্রশ্ন হতে পারে—মন খারাপ হলে পাগল হয়;—আত্মা যদি মন থেকে স্বতন্ত্র পদার্থই হবে, তবে শরীরের এবং মনের পরিবর্ত্তন তাতে লাগে কেন? তাকে অন্যরূপ করে দেয় কেন? উত্তরে বলা যেতে

৩

পারে, আত্মা কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হন না, তবে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তার অন্য কারণ আছে। ধর— একজন একটা বেহালা বাজাচ্ছে, হঠাৎ তার ছিঁড়ে গেল, আর বাজ্‌ল না। এ স্থলে যে বাজাচ্ছে, তার দোষ, না, বেহালার দোষ? সেইরূপ আত্মা রূপরসগন্ধ প্রভৃতি ভোগ কর্‌বার জন্যে মন ও দেহরূপ যন্ত্র সৃষ্টি করেছে। এ বিকল হলে আর কাজ হয় না। কিন্তু যন্ত্র বিকল হয়ে পূর্ব্বের ন্যায় আওয়াজ না বেরুলেই আত্মা যন্ত্রী যেমন তেমনি থাকে। আমাদের শাস্ত্র এইরূপে শরীর ও মন হতে আত্মার পার্থক্য দেখিয়েছেন। শরীর ও মন জড়, আত্মা চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ। শরীরের ন্যায় মনেরও উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ। আত্মা নিত্য ও অবিনাশী।

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

'আত্মা নিত্য, পরিবর্ত্তনরহিত এবং সকলের মধ্যে একভাবে রয়েছেন।'

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"

'এই দেহীর দেহে যেমন কৌমার, যৌবন, জরা আস্‌ছে, মরে গেলেও তেমনি একটি দেহ আসে অথবা পুনর্জ্জন্ম হয়। আমাদের শরীরের যেমন বৃদ্ধি, পূর্ণতা

এবং হ্রাসরূপ নানা পরিবর্ত্তন আছে, দেহান্তর প্রাপ্ত হওয়াও তেমনি একটা।' শাস্ত্র আরও বলেন যে, এ কথা আমরা যোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ জান্‌তে পারি।

আত্মা পরিবর্ত্তিত হন না। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তবে ভোক্তা কাকে বলি? কে ভোগ কর্‌ছে? কে সুখী, দুঃখী হচ্ছে? বেদ বলেন, যতক্ষণ আত্মা আপনাকে ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত বোধ করেন, ততক্ষণই তিনি ভোক্তা থাকেন, যখন ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সম্বন্ধ ঘুচে যায়, তখনই আত্মা আপনার যথার্থ পূর্ণ-স্বরূপ অনুভব করেন। শাস্ত্রে তাই বলে, আমরা যে আপনাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত ভাব্‌ছি, এটাই আমাদের কারণ-শরীর। কেননা, যথার্থ আমরা কে, এ কথাটি ভুলে গিয়ে যদি আমরা আমাদিগকে শরীর ও মনবিশিষ্ট বলে না ভাব্‌তুম, তা হলে অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই আমাদিগকে স্পর্শ করত না। ঐ ভুলে যাওয়াটাই যত নষ্টের গোড়া, অতএব ঐটেই কারণ-শরীর। কেবল মাত্র জ্ঞানলাভেই এই শরীরের নাশ হতে পারে, অন্য কোন উপায়ে হয় না। কিন্তু আপনার স্বরূপ ভুলে গেলেও আত্মার বাস্তবিক ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, আত্মা চিরকাল পূর্ণ। মনবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলে ভাব্‌লেই কি যথার্থ তাই হবে?

না, আত্মা যেমন তেমনি ঠিক আছে। পরমহংসদেব বল্‌তেন, যেমন চকমকি পাথর চারশ বছর জলের ভেতর রাখ, তুলে এনে ঠুক্‌লেই যে-কে সেই, আগুন বেরুচ্ছে, আত্মাও ঠিক তাই। শরীর মনকে যখনই দেখে বন্ধন, তখনই তা ফেলে দিয়ে আপনি কে, জেনে নেয়। আমরা সংসাররূপ স্বপ্ন দেখ্‌ছি। স্বপ্নও ত নানা রকম দেখি। যেন আমি মরে গেছি, যেন আমায় একজন কেটে ফেলেছে, রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে আর কাটা মুণ্ড ও ধড়টা সাম্‌নে পড়ে রয়েছে, আবার জাগ্‌লেই কোথাও কিছু নেই। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সকলেই একদিন তেমনি জেগে উঠ্‌বে। সেই জন্যেই শাস্ত্রকার যাস্ক বলেন, আত্মজ্ঞানে আর্য্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলের সমান অধিকার। সকলকে তা শিখাও। কে জানে, কার আত্মা কখন জাগরিত হবে? পরমহংসদেব বল্‌তেন, যদি তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় ত তিন বছরে, তিন মাসে বা তিন দিনেও আত্মজ্ঞান লাভ হতে পারে।

গীতাও বলেন —

"স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।"

'মৃত্যুকালে যদি ক্ষণমাত্রও এই জ্ঞানের উদয় হয় ত সমস্ত অজ্ঞান নাশ হয়ে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়।'

এই আত্মজ্ঞানই বেদের মূল ভিত্তি, ভারতের একমাত্র জাতীয় ধন। ভারত হতেই অপরাপর দেশে এই জ্ঞানের প্রচার হয়েছে। যেদিন ভারত এই জ্ঞানের কথা ভুলবে, সেদিন জাতীয়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে তারও নাশ হবে। অপরাপর দেশের লোকের এই জ্ঞান যথাযথ বুঝ্‌তে এবং অনুভব কর্‌তে এখনও ঢের দেরি। ধর্ম্মরাজ্যে এখনও আমরা জগতের গুরুস্থানীয় রয়েছি। ইংরাজ প্রভৃতি অপরাপর জাতকে বাণিজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধাদি অপর সমস্ত বিষয়ে গুরু স্বীকার করে শিক্ষা করো কিন্তু ধর্ম্মে এ স্থানটা অধিকার কর্‌বার এখনও তারা উপযুক্ত হয় নি। ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি পরমহংসদেব প্রমুখ সাধুদের ছেড়ে বিদেশী, বিধর্ম্মীর নিকট আপন ধর্ম্মের মহিমা শুন্‌তে যাওয়ার চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? আজকাল কোন কোন সম্প্রদায় বৈদিক ধর্ম্মের দুচার্‌টে তত্ত্ব আপনাদের ভিতর উল্টো করে ঢুকিয়ে নিয়ে যথার্থ ধর্ম্ম বলে শিক্ষা দিচ্ছে। কেউ বা বল্‌ছে, এককোটি জন্মের পর মানুষ চাক আর নাই চাক, মুক্ত হবেই হবে এবং তার আত্মজ্ঞান হবে। এরূপ কর্ম্মবাদ ঘোর অদৃষ্টবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বেদ কখন এরূপ শিক্ষা দেন না। বেদ বলেন, মানুষ মনে করলে এখনি মুক্ত হতে পারে, অথবা না মনে

করলে অনন্তকাল স্বপ্ন দেখ্‌তে পারে। মানুষের মুক্ত হবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় কোথাও দেওয়া হয়নি। পুরণাদিতেও বলা আছে মাত্র যে, চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে জীব মনুষ্য জন্ম পায়। মুক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট সময় কেমন করেই বা হতে পারে? জন্ম মরণাদিতে আত্মার ত কোন দোষ বাস্তবিক লাগে নি। আত্মা যেন নিদ্রিত; যেদিন ঘুম ভাঙ্গ্‌বে, সেদিন মুক্ত হবে। আত্মা সর্ব্বশক্তির আধার; যেদিন তা উপলব্ধি কর্‌বে, যেদিন জান্‌বে, আমি রাজার ছেলে, সেদিনই স্বস্থানে চলে যাবে, আপন মহিমায় বর্ত্তমান থাক্‌বে। কোন কোন সম্প্রদায় বল্‌ছেন, 'চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গনিবাসী মুক্তাত্মাদিগের সহিত তাঁহারা বিশেষ সম্বন্ধে অবস্থিত। নিত্য তাঁহাদের সহিত দর্শন, স্পর্শন এবং পত্র প্রেরণাদি পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।' বেশ কথা; হয়ে থাকে হোক! কিন্তু বেদ পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে যখন তাঁদের কিছুমাত্র নামগন্ধ নেই, তখন তাঁদের পরিচয় নেবার জন্যে আমাদের ব্যগ্র হবার প্রয়োজন নেই। আয়ু অল্প; যে যা বল্‌বে, তাই নিয়েই ছুটোছুটি করে হয়রান হবার সময় কোথা?

আত্মায় সুখ দুঃখের লেশ লাগ্‌ছে না; তিনি পূর্ণ। কিন্তু শরীর এই জড়রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত

হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, মানুষের মর্‌বার সময় কি হয়? স্থূল শরীরটা, যেটা নিয়ে মন খেল্‌ছে, তখন একেবারে বিকল হয়ে যায়;—তখন লোকে ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে ফেলে দিয়ে যেমন নূতন কাপড় পরে, আত্মা তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নূতন শরীর ধারণ করে আর এই শরীরে যে সমস্ত চিন্তা, চেষ্টা ও কার্য্য করা হল, তার সংস্কার মনের সঙ্গে থেকে যায়। মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় এবং রূপরসাদির সংস্কার এইগুলি আত্মার সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম জড়ে প্রস্তুত। মন ও ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের মৃত্যুতে নষ্ট হয় না, মৃত্যুর পরেও আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকে। অথবা স্থূল শরীরটা ফেলে দিলে আত্মার, আমি শরীর ও ইন্দ্রিয়বান, এ বোধ নাশ হয় না। তখন পূর্ব্ব শরীরের সংস্কারানুযায়ী হয়ে আত্মার অন্য একটা স্থূল শরীর ধারণের বা গঠনের ইচ্ছা হয় এবং যে পিতামাতার ঔরসে জন্মিলে আপন সংস্কার-বিকাশের উপযোগী শরীর পাওয়া যাবে, তাঁদের নিকট আকৃষ্ট হয়। পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়! ঐ সূক্ষ্ম শরীরের দৈর্ঘ্য, বিস্তার বা গুরুত্বাদি নাই এবং গর্ভাধানের দিন হতেই মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। সূক্ষ্ম শরীর চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না।

বটে, কিন্তু সেটাও জড়। বায়ু এবং আকাশের চেয়েও তা সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থূল শরীরের সাহায্যে যতদূর শিখে গেছে, নূতন জন্মে নূতন স্থূল শরীর পেয়ে আত্মা তার পর থেকে কাজ আরম্ভ করে এবং জ্ঞানলাভ করতে থাকে।

পূর্ব্বে যা বলা হল, তা থেকেই বেশ বোঝা যায়, কেন আমরা সকলে সমান বিদ্যাবুদ্ধি সম্পদ্ নিয়ে সকল বিষয়ে সমান হয়ে সংসারে জন্মাই না, কেনই বা সংসারে একটি মানুষের শরীর মন আর একটির সঙ্গে সমান হয় না? কেনই বা মানসিক, আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই আমাদের ভিতর স্বাভাবিক প্রভেদ বর্ত্তমান? পুনর্জ্জন্মবাদ হতেই এর বেশ মীমাংসা হয়। পিতার দোষগুণ সন্তানে আসে, এই কথা বলে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই সর্ব্ববাদিপ্রত্যক্ষ ভেদ বা বৈষম্যের মীমাংসা করেন, কারণ, শারীরিক নানা প্রকার রোগ, মানসিক অশেষ-বিধ দোষ বা গুণ পিতা হতে অনেক পরিমাণে সন্তানে আসে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সব স্থলে দেখা যায়, ছেলে বাপের মত আদৌ নয়, সেখানে তাঁরা শিক্ষার তারতম্য বলে বোঝাবার চেষ্টা করেন। এইরূপে দোষটা সব বাপের ও গুরুর উপর এসে পড়ে।

তাঁরা উক্ত ব্যক্তিগত বৈষম্যের অন্য সমাধান দিতে পারেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, এ প্রভেদ কর্ম্ম অনুসারে হয়। মানুষ যখনি যে কাজ করে, তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে করে এবং এ উদ্দেশ্য লাভ করতে তার নিজের ভেতরের এবং বাইরের কতকগুলি শক্তিকে এক বিশেষ ভাবে চালিত করে থাকে। ঐ সকল শক্তি যখন জাগরিত ও চালিত হল, তখন ফলস্বরূপ কতকগুলি পরিবর্ত্তন এনে দেবেই দেবে। ঐ পরিবর্ত্তন-গুলিকে আবার তার মন ভাল বা মন্দ, সুখ বা দুঃখ বলে বোঝে বা অনুভব করে। যদি ভাল বা সুখ বলে বোঝে, ত মন সেগুলিকে চিরকাল ধরে নিজস্ব করে রাখ্‌তে চায়। আর যদি মন্দ বা দুঃখ বলে বোঝে বা ভবিষ্যতে সেগুলি নিশ্চিত দুঃখ এনে দেবে এমনও বোঝে, তা হলে মন সেগুলিকে যে কোন উপায়ে হোক, তাড়াবার চেষ্টা করে। এইরূপে বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, আবার সেই গাছে ফুল ফল ও বীজ উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এক কর্ম্ম হতে সুখ বা দুঃখ ভোগ এবং অপর কর্ম্মও এসে উপস্থিত হয়। অনেক কর্ম্মের ফল বা সুখদুঃখ ভোগ হবার এ জন্মে সময় হল না, দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কাজেই তা পরজন্মে হয়ে থাকে।

বেদান্তে মনুষ্যকৃত সকল কর্মের পাঁচ ভাগে বিভাগ করা হয়েছে, যথা—নিত্য, আগামী, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও প্রতিষিদ্ধ। নিত্য কর্ম্ম শৌচ সন্ধ্যাদি প্রত্যহ কর্‌তেই হয়। কর্‌লে বিশেষ ফল নেই, না করলে দোষ আছে। প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি কর্‌তে শাস্ত্র নিষেধ করেন, যেমন, চুরি করো না, খুন করো না ইত্যাদি। সঞ্চিত কর্ম্ম-গুলি মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও তাদের ফল ভোগ কর্‌তে বাকি র[illegible]। তাদেরই মধ্যে কতকগুলির ফলভোগস্বরূপ মানুষ এ জন্মে ভাল বা মন্দ শরীর, মন ও নানা চেষ্টা প্রা[illegible] হয়েছে। এইগুলির নামই প্রারব্ধ। আর [illegible] জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলিকে বা যে কর্ম্মগুলির ফলে [illegible] জন্ম হবে, তাদের আগামী কর্ম্ম বলা হয়েছে। আগা[illegible], সঞ্চিত ও প্রারব্ধ, এই তিন প্রকার কর্ম্ম বোঝাবার জন্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁর রচিত গ্রন্থে একটি বেশ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যথা—একজন লোক ধনুক ধরে তীর ছুড়্‌ছে। একটা তীর ছুড়ে ফেলেছে। একটা ছুড়্‌বে মনে করে ধনুকে লাগিয়েছে আর কতক-গুলো তার পিঠে বাঁধা—তূণে রয়েছে। যেটা ছুড়ে ফেলেছে, সেটা যেখানে হয় লাগ্‌বে। ঐ তীরটার সঙ্গে প্রারব্ধ কর্ম্মের তুলনা করা যেতে পারে। ঐ

কর্ম্মের উপর মানুষের কোন হাত নেই। ঐ কর্ম্মের ফল তার শরীর মন ভোগ কর্‌বেই কর্‌বে। ইচ্ছা করলেও সে ঐ ফলভোগ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। সেই জন্যে মুক্ত পুরুষেরা আত্মজ্ঞান লাভ করেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল শরীরে ভোগ করেন।

যে তীরটা ছুড়্‌বে বলে হাতে নিয়েছে সেটাকে আগামী কর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঐ তীরটা যেমন সে ছুড়্‌তেও পারে, না ছুড়্‌তেও পারে সেই-রূপ আগামী কর্ম্ম মানুষ ইচ্ছা কর্‌লে রোধ কর্‌তে পারে। যে তীরগুলি পীঠে বাঁধা রয়েছে, সেইগুলোর সঙ্গে তার সঞ্চিত কর্ম্মের তুলনা হতে পারে।

শাস্ত্রকার বলেন, যে কর্ম্ম কর্‌ছ তার ফলভোগ কর্‌তেই হবে। একটা কর্ম্ম আবার অন্য কর্ম্ম প্রসব করে। এইরূপে কর্ম্ম-বন্ধন দিনে দিনে জন্মে জন্মে বাড়্‌তে থাকে। এর শেষ কবে হবে? যেদিন আত্ম-জ্ঞান লাভ হবে। মানুষ যেদিন দেখ্‌বে সে অখণ্ড, অবিনাশী, জরামরণরহিত পূর্ণানন্দময় আত্মা। সে কখন ভোগ করেও নি, কর্‌বেও না। শরীর ও মনই এতকাল কাজ করেছে ও ভোগ করেছে। জবাফুলের পাশে থাকাতেই রংটা কাঁচের গায়ে লেগেছে, কাঁচটা লাল দেখিয়েছে, তা বাস্তবিক কাঁচের রং নয়।

অথচ শুদ্ধস্বরূপ আত্মা আছেন বলেই সব কাজকর্ম্ম চলেছে, অতএব সেই জ্ঞান লাভ হলেই আর কোন কর্ম্মের জোর চলে না, সমুদয় কর্ম্ম শেষ হয়ে যায়, জ্ঞানাগ্নির তেজে সমুদয় ভস্ম হয়ে যায়।

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

এই জ্ঞান লাভই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। সুখই ভোগ কর বা দুঃখই ভোগ কর তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ওদুটোর একটাও নয়। সংসারে থাক্ বা সন্ন্যাসীই হোক্, ছাত্র-জীবনের মধ্যে বা ব্যবসা বাণিজ্যের ছুটোছুটির ভেতর যেখানেই থাকুক না কেন, মানুষ সকল অবস্থায় এমন ভাবে কাজ কর্‌তে পারে, যাতে তার প্রত্যেক কাজই তাকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেবে লোকে মনে করে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম জিনিষটা সংসার থেকে আলাদা করে রাখ্‌বার যো নেই। এটা বোঝবার জন্যেই যেন গীতার উপদেশ আরম্ভ হয়েছে রণভূমিতে, যেথায় হিংসা দ্বেষের তরঙ্গ গর্জ্জাচ্ছে। উদ্যমরহিত হয়ে থাক্‌বার সাবকাশ মাত্র নেই এবং মানব-মনের পৈশাচিক প্রবৃত্তিগুলোই নিঃসঙ্কোচে খেল্‌তে দাঁড়িয়েছে। এখানে যদি ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ উপদেশ ও অনুষ্ঠান চলে, তবে সংসারে আর এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে

তা চল্‌বে না? যে ধর্ম্ম সকলের জন্যে নয়, সে ধর্ম্ম কে চায়? তুমি সুখে থাক, শান্তি পাও আর আমি দুঃখকষ্টে মরি, এ শাস্ত্রকারের ইচ্ছা. নয়। যথার্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, গৃহস্থ জীবনে বা সন্ন্যাস নিয়ে সব জায়গায় চল্‌বে। ধর্ম্ম সকলকে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'মানুষ তুমি যে পূর্ণস্বরূপ, তাই আছ, হাজারই কেন মনে কর না, তুমি ক্ষুদ্র, তোমার শরীর আছে, তোমার সুখ দুঃখ ভোগ হচ্ছে, তুমি মর্‌বে ইত্যাদি, তুমি যা তাই আছ ও থাক্‌বে।' ধর্ম্ম বল্‌ছেন—

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।"

'যে কেউ আত্মাকে হন্তা বলে মনে করেন কিংবা মনে করেন আত্মা মরে, তাঁরা উভয়েই আত্মাকে জানেন না, আত্মা জন্মেনও না, মরেনও না।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।"

(আত্মা) কখনও জন্মেন না, বা মরেনও না'।

"বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ং।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥"

'যিনি নিত্যস্বরূপ আত্মাকে জানেন, তিনি কাকেই বা মার্‌বেন, কার দ্বারাই বা হত হবেন?' তিনি কিছুই

করেন না। তাঁর শরীর মন আমরণ আপনা আপনি কাজ করে চলে যায়। সৎকাজ, পরোপকার প্রভৃতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়।

দেখা গেল, আত্মজ্ঞান মানুষকে সুখদুঃখের পারে নিয়ে যায়। সেই জন্যে মানুষ যখন শোকে মোহে অবশ হয়ে পড়ে, তখন আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। ঐ জ্ঞান উপলব্ধি না করে অর্জ্জুনেরও শোক মোহ যায়নি। বিশ্বরূপ দর্শন না করে, এক মহাশক্তির হাতে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে রয়েছি, এ কথা অনুভব না করে কারও কোন দিন অজ্ঞান-প্রসূত শোক মোহ দুর্ব্বলতাদি লোপ হয় না। অর্জ্জুন যখন দেখ্‌লেন যে, সংসারে কারও কিছু কর্‌বার ক্ষমতা নেই, তখুনি তাঁর ভ্রম ঘুচ্‌লো, তখুনি তাঁর শোক মোহ দূরে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু যে এই আত্মতত্ত্ব বলে গেছেন মাত্র, তা নয়, কিন্তু সাধারণ ভাবে অর্জ্জুনকে আরও অনেক বুঝিয়েছেন। বলেছেন, তোমার যশ যাবে, তোমাকে লোকে কাপুরুষ ঠাউরে অবজ্ঞা কর্‌বে, তার চেয়ে তোমার মরণ ভাল ইত্যাদি। এ কথাগুলি অনেক সময় লোকে না বুঝে দোষ দেয়। মনে করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে কি

ছাই কথা বল্‌ছেন। তবে কি লোকে নিন্দা কর্‌বে বলে, ভয়ে অসৎ কাজগুলোও কর্‌তে হবে? না, তা নয়। একটু তলিয়ে দেখ্‌লে ভগবানের এ কথা-গুলিরও গভীর ভাব আছে দেখা যায়। দেখ্‌তে পাই, লোকে যার যশ করে, বাস্তবিক তার কোন-না-কোন বিশেষ গুণ আছে। যদি গুণ না থাকে, তবে সে যশ স্থায়ী হয় না। ভাল কাজ কর্‌লে সাধারণ লোকে তোমার সৎ উদ্দেশ্য বিশেষ করে না বুঝ্‌লেও গুণ কীর্ত্তন করে। কারও দোষ গুণ বিচার কর্‌বার জন্যে সম্মুখে ধর্‌লে অশিক্ষিত, অজ্ঞ মানুষও বুঝ্‌তে পারে। কেন না, সকলের ভেতর ভগবান্ রয়েছেন, তাঁর শক্তিতেই ভাল মন্দ বোঝ্‌বার ক্ষমতাও তাদের স্বভাবতঃ রয়েছে। যদি তোমায় লোকে নিন্দা করে, তবে তার দুটো কারণ হতে পারে। হয় লোকে তোমায় বুঝ্‌তে পারে না, তুমি এত উন্নত অথবা তুমি যথার্থ নিন্দার পাত্র। সে স্থলে আপনাকে তোমার প্রথমতঃ বোঝা দরকার। স্থির ভাবে আপনাকে খুব তন্ন তন্ন করে দেখে তবে লোকের কথা তোমার উপেক্ষা করা উচিত। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমেই দেখালেন যে, মোহের জন্যেই তাঁর এই ভাবের উদয় হয়েছে—ভয় হয়েছে—তাই তিনি যুদ্ধ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌ছেন। তাই অকারণ

লোকে তাঁর অযশ কর্‌বে না, এ কথা তাঁর জানা উচিত এবং মোহ ছাড়া উচিত,—

ভগবান তার পর বল্‌ছেন—

"অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥"

'আত্মা নিত্য জন্মাচ্ছেন ও নিত্য মর্‌ছেন, এ কথাও যদি স্বীকার কর, তা হলেও তোমার শোক করা উচিত নয়,' কারণ, মর্‌তে হবে, এটা সকলে জানে। যে দিন থেকে ছেলেটা জন্মাল, সে দিন থেকে সে মর্‌বার দিকেই এগুতে লাগ্‌ল। তাই বল্‌ছেন, এই অপরিহার্য্য বিষয়ের জন্যে ভাব্‌লে কি হবে? শরীর ত নিশ্চিত যাবেই। আবার জন্মাবে। তবে তার জন্যে আর শোক কেন? এ বিষয়ে শোক করা মূর্খের কাজ।

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥"

'মানুষ কোথা হতে এখানে এসেছে, কেউ জানে না, কোথা যাবে, তাও জানে না। এই যে সব সম্বন্ধ রয়েছে, তাও দুদিনের জন্যে, একথাও জানে। তবে আবার মিছে শোক কেন?' আর যদি মানুষকে অবিনাশী আত্মা বলে জেনে থাক, তা হলে সে ত

কখন মর্‌বে না, এ কথা স্থির। তবে আবার শোক কিসের ?

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

'সেই আত্মাকে কেহ বা আশ্চর্য্য হয়ে দেখে, কেহ বা এর আশ্চর্য্য স্বরূপ বলে, কেহ বা তাই অবাক্ হয়ে শোনে, আবার মন্দভাগ্য কেহ বা শুনেও এর বিষয় ধারণা করতে পারে না।'

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥"

'যদি এই যুদ্ধে হেরে যাও, ক্ষত্রিয় তুমি ; কর্ত্তব্য পালন করে সম্মুখ যুদ্ধে মরে স্বর্গে যাবে, জিত্‌লে রাজ্য পাবে অতএব যুদ্ধ কর।' কিরূপে যুদ্ধ করবে ?

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।"

'সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভ লোকসান সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ কর।' তা হলে পাপ স্পর্শ করতে পার্‌বে না। কিছু দেখো না। কেবল কর্ত্তব্য ও সত্য পালন করতে যুদ্ধ কর্‌ছ, এইটি দেখ। এই রকমে সংসারে যদি আমরা কাজ কর্‌তে পারি, সব সময়ে এই ভাব

যদি মনে রাখ্‌তে পারি, সংসারে এসে লাভ লোক্‌সানের দিকে নজর না রেখে যদি ঈশ্বরের চাকর চাকরাণীর মত কাজ করে যেতে পারি, কিছুতেই আর বন্ধন আস্‌বে না। ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে অগ্রসর হব। এইটি জ্ঞানযোগের মূল কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

(১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর, বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

গীতা প্রক্ষিপ্ত নয়, একথা আমি প্রথম বারে বলেছি। প্রক্ষিপ্ত নয়, তার একটা কারণ আছে। শাস্ত্রপাঠে দেখ্‌তে পাই, আমাদের দেশের দার্শনিকদের একটা অসাধারণ গুণ ছিল। সেই গুণটার একটু আধটু এখানকার দেশীয় ও বিদেশীয় দার্শনিকদের জীবনে এলে তাঁদের নিজের এবং অপর সাধারণের পরম লাভ হয়। আমাদের দেশের দার্শনিকেরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে কোন বিষয় প্রমাণ করে নিশ্চিন্ত থাকৃতেন না, কিন্তু যাতে সেটা জীবনে পরিণত কর্‌তে পারেন, তার চেষ্টা কর্‌তেন এবং পরিণত হবার পর ঐ সত্য জনসাধারণে প্রচার কর্‌তেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবন দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, তিনি গীতাতে যা বলেছেন, তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে তা অনুষ্ঠান করে তার সত্যতা দেখিয়ে

গিয়েছেন অথবা গীতায় প্রচারিত সত্য সকল তাঁর জীবনেই প্রথম সম্যক্ অনুষ্ঠিত, দেখ্‌তে পাই। অতএব তিনিই যে গীতাকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যোগের বিষয় পূর্ব্বে কতক বলেছি। মনের শক্তি উদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে পূর্ণভাবে চালিত করার নাম যোগ। দেখ্‌তে পাই, কোন ছেলে চেষ্টা করেও লেখাপড়া শিখ্‌তে পার্‌ছে না, পাশ কর্‌তে পার্‌ছে না, এর কারণ কি? তার মনের শক্তি এক জায়গায় জড় কর্‌তে পারে না, আর কতকগুলি বিষয়ের দিকে মনের কতকটা সর্ব্বদা পড়ে থাকে; সে সমস্ত মন গুটিয়ে নিয়ে এক বিষয়ে দিতে পারে না। মনের শক্তি অন্য-দিকে ব্যয় হয়ে যায়, সেজন্যে সে উদ্দিষ্ট বিষয় ঠিক আয়ত্ত কর্‌তে পারে না। যোগ মানে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাতে পৌঁছুবার বা তা লাভ করবার সহজ উপায়। সে সহজ উপায়টি কি? শরীর, মনের সমস্ত শক্তি গুটিয়ে এনে ঐ বিষয়ে লাগান। ধনলাভ হোক, অথবা ধর্ম্মলাভ হোক, পরের কল্যাণের জন্যে অন্য কোন কাজ হোক, তাতে কৃতকার্য্য হবার জন্যে অন্য কোন কাজ হোক, অথবা পরের কল্যাণের সহজ উপায়ের সাধারণ নামই 'যোগ' দেওয়া যেতে পারে। সমস্ত মন গুটিয়ে আন্‌বার শক্তি কোথা থেকে আস্‌বে?

সকল শক্তিই আমাদের ভেতর রয়েছে। কেন না, আত্মাই সকল শক্তির আকর। শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। ঐ সকল যন্ত্র নিয়ে তিনি এই অদ্ভুত খেলা খেল্‌ছেন। যন্ত্র খারাপ হলে যেমন কোন বিষয় ভাল করে করা যায় না, সেইরূপ মন, বুদ্ধি মলিন হলে আত্মার খেলাও তদ্রূপ হয়। তাঁর অশেষ শক্তি প্রকাশের সুবিধা হয় না। কিন্তু মন, বুদ্ধি যদি খুব শুদ্ধ হয়, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয়, তবে তাঁর ভেতরের শক্তির অদ্ভুত প্রকাশ হয়ে থাকে।

যোগ শব্দ সাধারণ ভাবে প্রয়োগ কর্‌তে পারলেও আমাদের শাস্ত্রে ত কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন জ্ঞানযোগ কাকে বলে, দেখা যাক্। পরমহংসদেব বল্‌তেন, একজ্ঞানই জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান। কোন বিষয়ে কারও বাস্তবিক জ্ঞান হয়েছে, কখন বল্‌ব? যখন সেই জ্ঞানের প্রকাশ—সে সকল জায়গায়, সকল জিনিষের ভেতর দেখ্‌বে। যার সুরজ্ঞান হয়েছে সে সকল শব্দের ভেতরই সুরের খেলা দেখ্‌তে পায়। একটা জিনিষ পড়্‌ল, একখানা গাড়ী দৌড়ুল, একজন লোক কথা কইল, এই সব ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ কোন্ সুরের কোন্ পরদায় হল, সে তা বুঝ্‌তে ও বল্‌তে পারে। এমন কি, সে ভিন্ন ভিন্ন

আওয়াজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখ্‌তে পায়। রঙের খেলাতেও সে সুরের খেলা দেখ্‌তে পায়। সমগ্র জগৎ তার কাছে অপূর্ব্ব স্বরলহরী মাত্র এবং নাদই জগৎ-কারণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়। পিথাগোরসের অনুভব হত, সূর্য্য-চন্দ্রের ঘোর্‌বার সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব সুর চলেছে। তিনি উহাকে Music of the Spheres বল্‌তেন। পরমহংসদেবের অনুভব হত, সমুদয় জগৎমধ্যে এক অপূর্ব্ব ওঙ্কার ধ্বনি উঠ্‌ছে। পাখীর ডাকে, নদীর তরঙ্গে, সমুদ্রের কল্লোলে, সেই ওঁ ওঁ ধ্বনি। সকল স্থানের সকল শব্দের ভেতর দিয়ে সকল সময়ে সেই অনাহত নাদ প্রবাহিত হচ্ছে।

সুর জ্ঞানের সম্বন্ধে যেমন, অন্যান্য বিষয়েও সেইরূপ। রূপ বা রস জ্ঞান যার হয়েছে, তার কাছে সমগ্র জগৎ রূপ ও রসের বিকার মাত্র বলে অনুভূত হয়। বহুজ্ঞান সকলেরই রয়েছে। সুখদুঃখের জ্ঞানও সকলের আছে। স্থূলচক্ষে যাদের জড় বলে মনে হয়, সে সকল পদার্থও আঘাতে প্রতিঘাত দিয়ে নিজ জীবন এবং কিছু-না-কিছু জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে। আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদির জ্ঞান "জ্ঞানমেতন্মনুষ্যানাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্" (চণ্ডী)—পশু, পক্ষী ও মানুষের সমান ভাবেই রয়েছে, এ জ্ঞানকে আমরা জ্ঞান বলি না। কিন্তু কতকগুলি

বিষয়ের ভেতর যদি আমরা এক শক্তির বিকাশ, এক নিয়মের খেলা দেখতে পাই, তবেই তাকে জ্ঞান বলে থাকি। ফলটা পেকে গাছ থেকে মাটিতে পড়্‌ল, ঢিলটা ছুড়্‌লুম্—মাটিতে এসে পড়্‌ল, মানুষ লাফ দিয়ে আকাশে উঠ্‌তে পার্‌ল না, পৃথিবীটা সূর্য্যের চারদিকে ঘুর্‌ছে ইত্যাদি জ্ঞানগুলিকে যত দিন না আমরা এক শক্তির প্রসূত বলে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, ততদিন ঐ বহুজ্ঞানগুলি আমাদিগকে জ্ঞানের পথে বড় বেশী অগ্রসর করেনি। আর যাই দেখ্‌লুম যে, ঐ সকলগুলি মাধ্যাকর্ষণ নামক এক শক্তির খেলায় হচ্ছে অমনি আমাদের জ্ঞান কতদূর ব্যাপিল, কতগুলি বিষয়কে আমরা একসূত্রে গাঁথ্‌তে পার্‌লাম, তা আর বলে বোঝাতে হবে না। এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ ও অনুভব সকলকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করার নামই জ্ঞান। এই সকল অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবার কয়েকটি শ্রেণীর অন্তর্ভূ্‌ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং শাস্ত্র বলেন, প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি এই সমস্ত শ্রেণীকে একের অন্তর্ভূ্‌ত দেখ্‌তে পান। এই একজ্ঞান একবার হলে আর কখনও অজ্ঞান আস্‌তে পারে না; এইজন্যে গীতা বলেন, জ্ঞানী তিনিই, যিনি সদা সর্ব্বত্র সেই একের প্রকাশ দেখেন। এই বহুজ্ঞানের ভেতর

যিনি সেই এককে দেখ্‌তে পান, "একো বহূনাম্," তিনিই মৃত্যুঞ্জয় হন, সুখদুঃখের পারে যান।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবনের সর্ব্বত্র এই শিক্ষাই দেখা যায় যে, জ্ঞানসহায়ে কিরূপে আমরা সেই একের কাছে পৌঁছুব। সে এক যাই হোক না কেন, তাতে কি এসে যায়? যা হতে এই সব হয়েছে, সে তাই, সেখানে যেতে হবে। তাকে যাই বল না কেন, ঈশ্বর, ভগবান, কালী, ব্রহ্ম—ঠিক বল্‌তে গেলে সে স্ত্রীলিঙ্গও নয়, পুংলিঙ্গও নয়, ক্লীবলিঙ্গও নয়। এখন সেই এক-জ্ঞান লাভের উপায় কি? পরমহংসদেব বল্‌তেন, একটা বিষয়ে যদি আপনার লাভ লোক্‌সান ভুলে ষোল আনা মন ঢেলে দিতে পার, তবে সেই এক-জ্ঞানে নিশ্চয় উপস্থিত হবে। সাধুই হও বা বিষয়ীই হও, যদি ষোল আনা হতে পার ত সেই একের প্রকাশ দেখ্‌তে পাবে। স্বদেশের জন্যে যদি ষোল আনা মন দিয়ে কেউ পাগল হতে পারে ত সেই দেশহিতৈষিতার ভেতর দিয়ে তার নিকট সেই একের প্রকাশ হবে। বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্প প্রভৃতি যে বিষয়ের চর্চ্চাই কর না কেন, যদি ষোল আনা মন দিয়ে কর ত তাই তোমাকে সেই জ্ঞানে নিয়ে যাবে। এ পরমহংস-দেবের কথা। বড় নূতন কথা, বড় অদ্ভুত সত্য! শুন্‌তে

যেমন সোজা, কর্‌তে তেমনি শক্ত। সব বিষয়েই ঐরূপ দেখি। যেটা খুব সহজ, সেটাই আবার খুব শক্ত। যেটা খুব নিকটে, সেটাই আবার খুব দূরে। গলায় হার রয়েছে, চারদিকে খুঁজছি, এ ভ্রম প্রায় হয়। আত্মা অত্যন্ত নিকটে কি না, তাই বুঝ্‌তে পারি না। তিনি যে আমারই ভেতর, এ কথা বিশ্বাস করি না। তাঁর দেখা পাবার জন্যে পাহাড় পর্ব্বত নানাদেশ ঘুরে উপোস করে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে দেখি, আমারই ভেতর তিনি। পরমহংসদেব বল্‌তেন, মানুষের মন যেন জাহাজের মাস্তুলের পাখী। কোন সময়ে একটা পাখী একখানা জাহাজের মাস্তুলের ওপর বসেছিল। জাহাজ খানা চল্‌তে চল্‌তে ক্রমে সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে পড়্‌ল। পাখীটা বসে বসে বিরক্ত হয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টায় উড়্‌ল। কিন্তু চারদিকেই জল। উড়ে উড়ে কোথাও স্থল না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে সেই মাস্তুলের ওপর এসে বস্‌ল। মানুষের মনও সেই রকম নানাদিকে নানাবিষয় অনুসন্ধান করে ক্লান্ত হয়ে, শেষে আপনার ভেতর সেই একের দেখা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

সর্ব্বদা সকলের ভেতরে থাক্‌লেও শুদ্ধ বুদ্ধির নিকট সেই একের জ্ঞান খুব কাছে। বদ্ধ জীবের জড় বুদ্ধির

অনেক দূরে। জ্ঞানযোগ সাধন করা বা জীবনে পরিণত করা শক্ত। অতি শুদ্ধ বুদ্ধি যাদের, তারাই পারে। বিচার করে কোন বিষয় ঠিক দেখে যখন তা তৎক্ষণাৎ কাজে কর্‌তে পার্‌বে, তখনই তুমি জ্ঞান-সাধন করবার উপযুক্ত অধিকারী। মনে উঠ্‌ল—বড় লোক হবো, দেশ জুড়ে গণ্যমান্য হবো। অথচ বিচার করে দেখ্‌লে, এই দুদিনের জীবনে নাম যশের চেয়ে ভগবান লাভের চেষ্টাই ঠিক। কিন্তু মনকে ধরে রাখ্‌তে না পেরে যদি তুচ্ছ ধনমানের জন্যেই ছোট, তা হলে তোমার দ্বারা জ্ঞানযোগ হবে না, তোমার অন্য রাস্তা। যে জ্ঞানযোগের সাধক, মন তার মুঠোর ভেতর, আয়ত্তের ভেতর থাক্‌বে, যা হুকুম করবে, তাই করবে। ভগবান যীশু যখন নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের জন্যে চল্লিশ দিন উপবাস করে তপস্যা করেন, তখন শয়তান প্রলোভন দেখাতে এসেছিল। ধন দেবে, মান দেবে, রাজ্যসম্পদ দেবে, সুন্দরী স্ত্রী দেবে ইত্যাদি বলেছিল। তাই শুনে তিনি অমনি বলে উঠ্‌লেন, Get thee behind me, Satan! বাসনা-শয়তান, দূর হও। আমাদের ভেতরেও ঐ রকম অনবরত বাসনা উঠ্‌ছে। নানান্ জন্মের বাসনা সব ফুটে উঠ্‌ছে। আবার যখন সৎ উদ্দেশ্যে সাধারণ-কল্যাণের জন্যে কোন কাজ

কর্তে যাচ্ছ, তখুনি রক্তবীজের বংশের ন্যায় বাসনা সন্তান শত শত এককালে জাগরিত হয়ে ব্যাকুল করে তুল্ছে। যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, তিনি ঐ সব বাসনা-বীজ দেখতে এবং মন থেকে তাড়াতে পারেন। কিন্তু সংস্কার যদি বেশী দৃঢ় হয়, তবে আর শুধু বিচার করে তাড়াতে পারা যায় না। ঐপ্রকার লোকের অন্য পথ। সংস্কার অল্প হলে বিচার করে মন ঠিক রাখা যেতে পারে। জ্ঞানযোগ যিনি সাধন করেন, তাঁর বাসনা তত প্রবল নয়, মন সহজেই তাদের আয়ত্ত কর্তে পারে এবং স্থির থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ জীবনে মহাজ্ঞানীর ভাব প্রতিপদে দেখ্তে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সঙ্কট স্থলেও তাঁর কি অদ্ভুত সমুদ্রবৎ স্থিরত্ব ও গাম্ভীর্য্য। ফলফুলশোভিত মধুর বৃন্দারণ্যে, শত্রুবেষ্টিত মথুরায়, রাজকুলসম্মানিত হস্তিনায়, রাগদ্বেষপূরিত রণস্থলে, পূর্ব্ব-স্মৃতি মুখরিত প্রভাসে এবং স্ববংশধ্বংসের সময়ও সেই স্থির, অচল, অটল ভাব। যদুকুল ধ্বংস হবার পূর্ব্বেই তিনি দেখ্লেন, কার্য্যকারণ-প্রবাহের ফলস্বরূপ তা ঘট্বেই ঘট্বে। এদের কর্ম্মেই এই ভীষণ ফল প্রসব করবে। অশেষ চেষ্টায়ও যখন তা ফিরল না, তখন মহাজ্ঞানী গীতাকার স্থির হৃদয়ে আপন বংশের নিধন

দর্শন করলেন। নিজের সাম্‌নে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ মন অবিচলিত হয়ে চুপ করে আছে। স্বামিজী বল্‌তেন, গীতার ভাব হচ্ছে Intense activityর ভেতর Intense rest, অবিরাম কার্য্যের ভেতর অদ্ভুত বিশ্রাম্, যোগীর অচল ভাব। গীতাসম্বন্ধে স্বামিজীর এইভাবে একখানি ছবি আঁকার ইচ্ছা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সারথি বেশে ঘোড়ার লাগাম ধরে সৈন্যদলের ভেতর রথ চালাচ্ছিলেন, এমন সময় বিষাদাভিভূত অর্জ্জুন লড়াই করবে না বলাতে এক হাতে তেজীয়ান ঘোড়াকে টেনে আয়ত্তে রেখেছেন আর অর্জ্জুনের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। শরীরের দ্বারা ঘোটক-সংযমরূপ মহা আয়াস করলেও মনের অনন্ত প্রশান্তভাবের জন্যে মুখে যোগীর ছবি আঁকা রয়েছে। ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের ভেতরও তাঁর মনের এই অপরূপ প্রশান্ত ভাব আঁকাবার তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে কত রাজা মহারাজা মর্‌বে, কোন্ পক্ষে জয় পরাজয় তার কিছুই ঠিক নেই, সকলেই অস্থির, আত্মহারা, পাগল, কিন্তু তিনি স্থির, অটল, অচল হয়ে অপরের কল্যাণের জন্যে, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যে সকল কাজ চালাচ্ছেন আবার সেই সময়েই যোগের অতি গূঢ় বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন। এই স্থিরতা প্রত্যেক মানবের শিক্ষা করা

চাই। কাজ করতে করতে আমাদের ভেতর কাজের মত্ততা এসে যায়। সেইটেই খারাপ। তখন আমরা কাজ না চালিয়ে কাজ আমাদের চালায়, ইন্দ্রিয় আমাদের চালায়। প্রভু দাসপদে নত হয়, অহঙ্কৃত দাস প্রভুর প্রতি যা ইচ্ছা ব্যবহার করে। এই জীবন-সংগ্রামে, কার্য্যক্ষেত্রে সেই জন্যে সদাসর্ব্বদা স্থির থাক্তে হবে। এই জন্যেই গীতার শিক্ষা, শুধু সন্ন্যাসীর জন্যে নয়, সংসারীর জন্যেও নয়, কিন্তু সকল দেশের, সকল কালের, সকল লোকের জন্যেই প্রযুক্ত। এই জন্যেই গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ। কেন না, উপনিষদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিশেষত্বই—তাদের সার্ব্বজনীন উদারতা; সকল প্রকার অধিকারীর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়ে উপনিষদের ঋষি আবার মুক্তকণ্ঠে প্রচার করছেন, 'মানুষ, তুমি অমৃতের অধিকারী, অমৃতই তোমার স্বরূপ; তুমি ভ্রমে পড়ে আপনাকে আর্য্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি যাই মনে কর না কেন, কিছুই তোমায় বাঁধতে পারে না। তুমি স্বাধীন, স্বাধীন, চিরস্বাধীন।' এই অপূর্ব্ব উদারতা গীতার মধ্যে দেখেই মাহাত্ম্যকার লিখেছেন, সমস্ত উপনিষৎ মন্থন করে গীতার উৎপত্তি হয়েছে।

জীবন-সংগ্রামের এই মত্ততার ভেতর, এই যোগীর

স্থিরতা আমাদের আনা চাই। কাজ করতে গেলেই যে একটা Reaction বা প্রতিক্রিয়া আসে, তার হাত থেকে বাঁচতে শেখা চাই। তবেই তোমার দ্বারা যথার্থ বড় কাজ হবে, তবেই তুমি ঠিক মানুষ নামের যোগ্য হবে। ফলাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত এই কর্ম্মমত্ততা কত সময় কত যে বিষময় ফল প্রসব করে, তা আর দেখিয়ে দিতে হবে না। ব্যবসা বাণিজ্যে লোক্‌-দিয়ে কত লোক হতাশ-সাগরে ডোবে, আর উঠ্‌তে পারে না; পাশ করার মত্ততায় পড়ে কত ছেলেই না একেবারে চিররোগী হয়ে পড়ে! আবার অশেষ চেষ্টায়ও পাশ না কর্‌তে পেরে ছাত্রদের মধ্যে সময়ে সময়ে আত্মহত্যার অভিনয়ও দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এই মত্ততার ভেতর স্থিরতা আন্‌তে শেখা সকলেরই প্রয়োজন, বিশেষতঃ সংসারী লোকের। কারণ, তার পক্ষে সাংসারিক ও পারমার্থিক সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ কর্‌বার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, এবং কর্ম্মের ভেতর এই স্থিরতা আন্‌তে পার্‌লে উদ্যমের কিছুমাত্র হ্রাস যে হবে, তা নয়, এ কথা গীতাকারের নিজ জীবনেই সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত জীবনের সহিত গীতার শিক্ষা মিলিয়ে নাও, দেখ্‌বে, এতেও এতটুকু অনৈক্য নেই। স্বার্থের

জন্যে কর্ম্ম না করলেও তাঁর একার কর্ম্ম-উদ্যম অসংখ্য লোকের উদ্যমের চাইতে অধিক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের খেলার ভেতর দেখ, মথুরার এবং দ্বারকার রাজসম্পদের ভেতর দেখ, যদুবংশ ধ্বংসের সময় দেখ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ, সব জায়গায় অপূর্ব্ব কাজের মত্ততার ভেতর তাঁর হৃদয়ে এই অদ্ভুত স্থিরতা ও শান্তি দেখ্‌তে পাবে। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন রাজাকে তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা প্রদান করেন। দুর্য্যোধন ভাবলে, একা শ্রীকৃষ্ণকে দলে না পেলাম, তাতে কি? তাঁর একার উদ্যম কিছু আর একাদশ অক্ষৌহিণী লোকের উদ্যমের সঙ্গে সমান হবে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, ঠিক তার বিপরীত। তাঁর উদ্যম ও অধ্যবসায়, বিপদ্‌কালে তাঁর অনন্ত উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি, ঘোর নিরাশ-অন্ধকারে তাঁর প্রাণসঞ্চারিণী অগ্নিময়ী বাণী, আবার মৃত্যুর ছায়ার ভেতর, স্বপক্ষের পরাজয়ের ভেতর, তাঁর অপূর্ব্ব অনবসাদ ও চিত্তপ্রসন্নতা, এই সমস্ত গুণ তাঁকে একাদশ অক্ষৌহিণী কেন, ভারতসমরে সমাগত উভয় পক্ষীয় সমস্ত বীরের সহিত সমতুল্য করেছিল।

জ্ঞানযোগের সার কথা এই। জ্ঞানযোগের সাধন

হচ্ছে, 'নেতি, নেতি' বিচার অর্থাৎ যা একত্বে নিয়ে যাবার পথে অন্তরায়, তা বিচারপূর্ব্বক এককালে পরিত্যাগ করা। জ্ঞানযোগ শুনে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, 'জ্ঞানী হলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হলে, তার লক্ষণ, চাল-চলন, আচার ব্যবহার ইত্যাদি কিরূপ হয়?' এই খরস্রোত কর্ম্ম-প্রবাহের ভেতর যিনি সর্ব্বদা নিজ জীবনে স্থিরভাব রাখতে পেরেছেন, তাঁর Expression অর্থাৎ ভাষা, চাল-চলন এবং অপরের সঙ্গে ব্যবহার কেমন হয়? সিদ্ধপুরুষেরা যেমন ভাবে সংসারে কাজ-কর্ম্ম করে গেছেন, সেই সকল আমাদের শিক্ষার জন্যে গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। প্রশ্ন হতে পারে, তাঁদের চাল-চলন দেখে আমরা শিখ্‌ব কি করে? আমরা জড়বুদ্ধি, কর্ম্মফলপ্রত্যাশী, কাম-কাঞ্চনলুব্ধ জীব, আমাদের জীবনে তাঁদের ন্যায় মহৎ উদ্দেশ্য ত নেই? নেই সত্য, কিন্তু সেই প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য, সেই প্রকার বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থ উদ্যম জীবনে না আনতে পারলে উন্নতির আশা কোথায়? আবার আমাদের ভেতর যাঁরা গুরুর উপদেশে বিশেষ উদ্দেশ্যে জীবন চালাতে চেষ্টা কর্‌ছে, কর্ম্মাবর্ত্তে পড়ে অনেক সময় তারা কি কর্‌বে, কিছু ঠিক কর্‌তে পারে না। অথবা সেই পথে চল্‌তে যে নব নব ভাব ও অনুভব

জীবনে উপস্থিত হয়, সেগুলি ঠিক কি না, এ সন্দেহে তাদের মন ব্যাকুল হয়, তখন এই সকল জগদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁদের জীবনের অনুভবের সঙ্গে নিজ নিজ জীবনের উপলব্ধি মিলিয়ে পেলে সংশয় সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। সেই জন্যে শাস্ত্র বলেন, সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে সাধক নিজ জীবনে আনবার চেষ্টা কর্‌বে। এই-ই তার পক্ষে প্রধান সাধন।

সাধকের নিজ জীবনের উপলব্ধির সঙ্গে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য মিল্‌লে সে অনুভবে আর ভুল নেই, একথাও ধারণা করতে শাস্ত্র বলেন। শুকদেব আজন্ম জ্ঞানী হয়েও যতদিন না নিজের উপলব্ধ জ্ঞান—গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন, ততদিন তাঁর নিজের অনুভব ঠিক কি না, এইরূপ সন্দেহের হাতে মধ্যে মধ্যে পড়্‌তেন এবং মহর্ষি ব্যাসকে এই সন্দেহ দূর কর্‌বার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাস দেখ্‌লেন, আমি শুকের বাপ, আমার কথা সে বাল্যাবধি শুনে আস্‌ছে, তাতেও যখন সন্দেহ যায় নি, তখন এর অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। ভেবে চিন্তে তিনি শুককে রাজর্ষি জনকের নিকট

গিয়ে তাঁকে গুরু স্বীকার করে উপদেশ নিতে বল্লেন। জনকের বাড়ীতে গিয়ে শুককে সাতদিন দরজায় দাঁড়িয়ে থাক্তে হয়েছিল, কেউ খোঁজখবর নেয় নি। এরূপ অবজ্ঞাতেও তাঁর চিত্তে রাগদ্বেষাদির উদয় হল না। পরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে রাজর্ষি জনক তাঁর অশেষ মান্য ও অদ্ভুত সেবা করতে লাগ্লেন। এরূপ সম্মানেও শুক তাঁর উদ্দেশ্য ভুল্লেন না। তখন জনক তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানের সমতা ও অবিচলতা বুঝিয়ে দিলেন। জনকের কথাতে বাপের কাছে যে সব শাস্ত্র পড়েছেন, সে সব শিক্ষার আর নিজের উপলব্ধির একতা শুক যখন মিলিয়ে পেলেন, তখন তাঁর সকল সন্দেহ দূর হয়ে মনে শান্তির উদয় হল।

জ্ঞানীর লক্ষণ সম্বন্ধে গীতা এখন কি বলেন, তাই দেখা যাক্।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

সকল বাসনা ছেড়ে যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট হয়ে আছেন, যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে আয়ত্তাধীন করেছেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশ না হয়ে ইন্দ্রিয়গণকে আপন উদ্দেশ্য লাভের জন্যে খাটিয়ে নেন, তিনি যথার্থ জ্ঞানী। জ্ঞানী পুরুষ আমাদের মতনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

কাজ কর্ম্ম করেন, কিন্তু কখনও আপনার উদ্দেশ্য ভোলেন না। ইন্দ্রিয়গণ যে তাঁর চাকর এবং তিনি তাদের প্রভু, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখেন। আমরা ঐ কথাটা কেবল ভুলে যাই। তাই ইন্দ্রিয় যে দিকে চালায়, সেই দিকে ছুটি। উপনিষদ্ বলেন, আত্মা যেন রথী, এই শরীররূপ রথে আরোহণ করে রয়েছেন, ইন্দ্রিয় সেই রথের ঘোড়া এবং মন সেই ঘোড়ার লাগাম। বুদ্ধি সারথি সেই লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে রূপ রসাদি বিষয়ের পথ দিয়ে জ্ঞান ও শান্তিরূপ লক্ষ্যস্থানের দিকে চালাচ্ছে। শিক্ষার গুণে সারথির নিজের মাথার ঠিক থাক্‌লে ঐ সব পাগ্‌লা ঘোড়াদের ঐরূপ দুর্গম পথের ভেতর দিয়েও ঠিক চালিয়ে নিয়ে যান। আর তা না হলে ঘোড়াগুলো রাশ না মেনে কোন্ পথে যেতে কোন্ পথে নিয়ে যায়; কখন বা গাড়ীখানা উল্‌টেও দেয়। শুদ্ধ বুদ্ধি ঘোড়া চালিয়ে গন্তব্যস্থলে ঠিক উপস্থিত হয়। কিন্তু কামকাঞ্চন-বদ্ধদৃষ্টি মলিন বিষয়বুদ্ধি ঘোড়ার বশীভূত হয়ে পড়ে সর্ব্ব-নাশের পথে অগ্রসর হয়।

জ্ঞানীর অপর এক লক্ষণ হচ্ছে, তিনি সুখদুঃখ উভয় অবস্থাতেই স্থির থাকবেন। আমরা স্বার্থপর, নিজেদের সুখের জন্যে লালায়িত। এতটুকু দুঃখ উপস্থিত হলে একেবারে আত্মহারা হই; ইচ্ছায় নিজেকে বিপদ্‌গ্রস্ত

করে পরের কাজে যাওয়া ত দূরের কথা, ঘরের পাশে প্লেগ হয়, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত থাকি। এই যে দেশে এত দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, আমরা তার কি কর্‌ছি? এ যদি ইউরোপের কোন স্থানে হত, ত দেশের সমস্ত লোক একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌ত। বল্‌ত, কেন দুর্ভিক্ষ হবে? কেন আমার দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মর্‌বে? তারা জীবন উৎসর্গ কর্‌তো তা দূর কর্‌বার জন্যে। আমরা এ বিষয়ে জড়, মহাতমোগুণী; কাজে একেবারে অলস। ডিগ্‌বি সাহেব লিখ্‌ছেন, বিগত ১০৭ বৎসরের লড়াইয়ে পৃথিবীর ভেতর যত লোক মরেছে, এই ভারতবর্ষে তার ৪ গুণ অধিক লোক মরেছে গত ১৯ বৎসরের দুর্ভিক্ষে। কি ভীষণ ব্যাপার! আমরা আবার চেঁচাই, বড়াই করি,—আমাদের বাপ দাদা পৃথিবীতে ভারি বড়লোক ছিল। তারা বড়লোক থাক্‌লেও তোমার কাজ দেখে তোমাকে ত সে বংশের সন্তান বলে বোধ হয় না; তুমি কি কর্‌ছ, তা একবার ভেবে দেখ দেখি। তুমি, 'আমি ব্রাহ্মণ, জগতের পূজ্য', বল্‌লে কি হবে? যে সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, সে ভাব যে একেবারে লোপ হয়ে মহা জড়ত্ব আস্‌তে বসেছে। আর এই মলিনমুখ, ছিন্নবস্ত্র, ভারতের শ্রমজীবী, যাদের শূদ্র বলে

চিরকাল পায়ে দলেছ, অথচ যাদের পরিশ্রম, যাদের অধ্যবসায়, যাদের শিল্পনৈপুণ্যের জোরে ভারত আজও বিখ্যাত, যাদের বংশধরদের নিকট হতে কর আদায় করে এখনও দেশে স্কুল, কলেজ এবং তোমাদের ছেলেদের শিক্ষার বন্দোবস্ত হচ্ছে, তাদের দিকে এখনও কি তোমরা ফিরে চাও, আপনার বলে দেখে তাদের দুঃখে একবারও কি দুঃখিত হও? এই জাতীয় পাপের ফলেই আজ দেশের এই শোচনীয় অবনতি। আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, কর্ম্মফলদাতা কর্ম্মের ফল দেবেনই দেবেন। ভাবের ঘরে চুরি হলে এইরূপই হয়ে থাকে। আমরা মুখে বলি, সর্ব্বঘটে নারায়ণ আর সকল স্ত্রীতে দেবী জগদম্বার আবির্ভাব। কিন্তু কার্য্যকালে ও বেটা চাষা, ও বেটা চাঁড়াল, ওকে ছুঁলে নাইতে হবে, ওর দৃষ্টিতে আমার ভাত নষ্ট হবে, ওর ছায়া মাড়ালে আমি অপবিত্র হব। এই মুখে একখানা, পেটে একখানা, কখনও কারও চেষ্টায় যদি দেশ হতে দূর হয়, ত তা ছাত্রদের দ্বারাই হবে। ছাত্রেরা এখন থেকে শাস্ত্রকথিত এই সকল সত্য হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করে যদি প্রাণপণে দেশের এই অজ্ঞান দূর করে, তবেই হবে!

জ্ঞানীর লক্ষণে গীতা পুনরায় বল্‌ছেন ;—বীতরাগ-

ভয়ক্রোধঃ।' আমি একটা জিনিষ লাভ করতে বিষেশ আগ্রহ ও চেষ্টা করছি। এমন সময় আর কেহ বা কিছু মাঝে এসে সেই পথের অন্তরায় বা বাধা হল। তখন তার প্রতি মনে যে ভাব ওঠে, সেইটেরই নাম ক্রোধ। আর কোন কিছু লাভ কর্‌বার অতীব আগ্রহের নামই রাঁগ বা কাম। এই কাম ক্রোধ যার নেই, তার কোন বিষয়ে আসক্তি থাকে না। আমরা যে কাজই করি না কেন, যদি আসক্ত না হয়ে করি, তা হলে তাই আমাদের একজ্ঞানে নিয়ে যাবে। প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাব, ধ্যান্‌ জপাদির ন্যায় প্রতিদিন করণীয় সাধারণ কাজ সকলও তখন যোগীর লক্ষ্য একজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব আসক্তি আস্‌তে দেওয়া হবে না। উচ্চ উদ্দেশ্যে সব কাজ কর্‌তে হবে, অথচ স্থির থাক্‌তে হবে। জ্ঞানী পুরুষ যে সব কাজ করেন, স্বার্থপ্রসূত কাম ক্রোধাদির বশে করেন না। অতএব ইন্দ্রিয় জয় করা, স্বার্থপর কামনা বাসনা ত্যাগ করা আর সুখ বা দুঃখে অবিচলিত থেকে উদ্দেশ্যে স্থির থাকাই জ্ঞানলাভের উপায়।

তারপর গীতাকার জ্ঞানের মহিমায় বল্‌ছেন,—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

হে পার্থ, ইহারই নাম ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থির রাখা।

একবার এই ভাব জীবনে এলে আর শোকমোহাদি [illegible] কষ্ট দিতে পারে না। মৃত্যুর [illegible] ভাব ঠিক ঠিক এলে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ হয়। অতএব যদি জ্ঞানী হও, নেতি নেতি করে সব ছেড়ে দাও। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করে, কাজ কর্‌তে হয়—করো। যদি সত্যের উদ্দেশ্যে সব ছাড়তে না পার, তবে তোমার পথ কর্ম্মযোগ। বল্‌তে পার, কর্ম্ম ত সকলে কর্‌ছে। তা করে জ্ঞান লাভ কি করে হবে? তা নয়। আপনারি ভোগ সুখাদির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হাজার হাজার বৎসর কর্‌লেও তা কখনও আমাদের একজ্ঞানে নিয়ে যাবে না। যেমন শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি সাধারণ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, পশু ও নরে সমান ভাবে আছে, সেইরূপ আপন সুখের জন্য কৃতকর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্ম নহে। ঐ প্রকার কর্ম্মও 'সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।' ঐরূপ কর্ম্ম বন্ধনের ওপর বন্ধনই এনে দেয়। অতএব প্রকৃত কর্ম্ম কর্‌বার কৌশল জানা চাই। নতুবা আমরা সকলেই ত কর্ম্ম কর্‌ছি। চুপ করে থাক্‌বার ত যো নেই। জড়ের ভেতর, চেতনের ভেতর, সকলের ভেতরই কর্ম্মকৃত এই অবিরাম গতি চলেছে। মনের ভেতর, বুদ্ধির ভেতরও সেই গতি সর্ব্বদা ছুটছে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।

সকলেই আপনার আপনার স্বভাব নিহিত গুণের বশে অবশ হয়ে কর্ম্ম কর্‌ছে। যার কাম বেশী, সে কামের চেষ্টায় ফির্‌ছে। যার ক্রোধ বেশী, সে তার দাস হয়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে। যার লোভ বেশী, সে নিত্য নূতন জিনিষের পেছনে ছুটোছুটি করে হয়রান হচ্ছে। আবার যার সাধুতায় হৃদয়পূর্ণ, সেও সৎকাজের অনুষ্ঠানে জীবন কাটাচ্ছে। এইরূপে কর্ম্ম সমস্ত জগৎ ব্যাপে অধিকার স্থাপন করে রয়েছে। প্রত্যেক অণুর ভেতরে, রাসায়নিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুক্ষণ চলেছে। এও কর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। তোমার মনের ভেতর যেমন সর্ব্বদা কাজ চলেছে, ওদের ভেতরও তেমনি। অতএব কাজ করছ বলেই যে একত্ব লাভ কর্‌বে তা নয়। 'কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।' যোগের আশ্রয় নিয়ে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্‌তে হবে, তবেই হয়। এমন ভাবে সকল কাজ কর্‌তে হবে, যাতে সেই একজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। গীতা বলছেন, কাজ কখনও ছেড়ো না। কিন্তু এমন কৌশলে কর, যাতে তোমায় কাম-কাঞ্চনে না বাঁধতে পারে!

গীতাতে কর্ম্ম করা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথা বলা হয়েছে, দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এমন কি, এক একবার মনে হয়, কর্ম্ম করা যে উচিত, এবং যতক্ষণ শরীর থাক্‌বে, ততক্ষণ সকলকেই যে কোন না কোন ভাবে কর্ম্ম কর্‌তে হবে, এ সব ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য, এর উপর গীতাকার এত কথা কেন বল্‌ছেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে গীতোপদেশের পূর্ব্বাবধি ভারতের দর্শনের চর্চ্চা অত্যধিক হয়েছিল। দর্শনের নানা মত নিয়ে নানা সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছিল। দর্শনচর্চ্চার ফলে এও স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মন অন্তবিশিষ্ট, নামরূপ বা দেশ কাল ও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের গণ্ডির বাইরে মনের যাবার শক্তি নেই এবং কোন কালে যেতেও পার্‌বে না। মনের এই সসীম স্বভাব সম্বন্ধে সকল দর্শনকারই একমত ছিলেন। অতএব তাঁদের সকলের অনুসন্ধানের এই এক উদ্দেশ্যই হয়েছিল যে, মানুষ কি করে এই সসীম মনের পারে গিয়ে অনন্ত সত্যের অধিকারী হতে পারে। মন যখন সীমাবদ্ধ, কখন অনন্তকে ধর্‌তে পার্‌বে না, তখন সম্পূর্ণরূপে মন স্থির করে বসে থাকা, সত্য লাভ কর্‌বার ইহাই একমাত্র উপায় বলে প্রচারও হয়েছিল। ঐরূপ প্রচারের ফলে অপর সাধারণ লোকেরাও বুঝুক আর নাই বুঝুক, সেই দিকে যেতে লাগ্‌ল। ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ মনকে যথার্থ স্থির করে

নিলেন, কিন্তু জড়-দর্শী অপর সাধারণ কেবল মাত্র বাইরে কাজ ছাড়্‌ল, কেহ কেহ বা নাম মাত্র সন্ন্যাসী হল। সাধারণের সেই বিপরীত বুদ্ধি ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যেই গীতাকারের কর্ম্ম করা উচিত কি না, এই বিষয় নিয়ে এত তর্কের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই জন্যেই তাঁর যথার্থ কর্ম্মই বা কি, কেমন করেই বা কর্‌তে পারা যায় এবং যথার্থ কর্ম্মরহিত হয়ে সকল বন্ধন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়াই বা কি তা বোঝাবার এত চেষ্টা। সেই জন্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের অনেক স্থলে কর্ম্মযোগ কাকে বলে, এ কথা সবিস্তার বুঝিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

(১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি, কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের মতে ভারত-বর্ষের ধর্ম্মই বল, দর্শনই বল, কেবল বৈরাগ্যের কথাই বল্‌ছে;—সংসারের কোন বিষয়ে মন দিও না, কেবল ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, এই কথাই বল্‌ছে। তাঁরা বলেন, সেই জন্যেই হিঁদু জাতটার ভেতর একটা melancholy বা বিষাদের ছায়া, একটা কর্ম্মে উদাসীনতা বা উদ্যমরাহিত্য, দুদিনের জীবনে এ সব আর কেন, এই রকম একটা ভাব এবং তার ফলস্বরূপ আলস্য ও জড়তা এসে পড়েছে। কথাটা কতদূর সত্য, তা গীতা পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়। ভগবান্ গীতাকার কেবল যে বার বার বল্‌ছেন, কর্ম্ম ছেড়ো না, তা নয়। কিন্তু নিজ জীবনে প্রতিক্ষণে দেখাচ্ছেন, intense activity with intense

rest,—অপূর্ব্ব কর্ম্ম-উদ্যমের মধ্যে অপূর্ব্ব বিরাম। সব কাজ কর্‌ছেন, অথচ ভেতরে অনন্ত স্থিরতা। একেই গীতাকার নির্লিপ্ততা, অনাসক্তি ইত্যাদি নামে নির্দ্দেশ করেছেন। অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে বলেন, হিন্দুশাস্ত্র মানুষকে অকর্ম্মণ্য করেছে, এ কথা সত্য নয়। ওঁরা মনে করেন, ওঁদের ধর্ম্ম ওঁদের জাতটাকে বড় লড়ায়ে করে তুলেছে এবং সে জন্যই ওঁদের ভেতর সাংসারিক উন্নতি এবং কর্ম্মোদ্যম এত বেশী। সেটাও বাস্তবিক ঠিক কথা নহে। বাইবেলে প্রত্যেক জায়গায় বৈরাগ্যের উপদেশ:—"The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the son of man hath not where to lay his head."— কাল্‌কের জন্যে কিছু ভেবো না, আকাশের পাখীরও বাসা আছে এবং বন্য পশুরও থাক্‌বার গর্ত্ত আছে, কিন্তু শিক্ষাদাতা যে আমি, আমার মাথা গুঁজে থাক্‌বার একটুও স্থান নেই। ঈশার জীবনী আমাদের দেশের সন্ন্যাসিজীবনের মত—পড়্‌লেই বুঝা যায়। ওঁরা এখন বাইবেলের মানে ঘুরিয়ে আপনাদের দরকার মত মানে করে নিয়েছেন। তা বলে কি সেই মানে নিতে হবে? গীতা বলেন, মানুষের ধর্ম্মানুষ্ঠান তার প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। Anglo Saxon

জাত সকলকে দাবাবে, সকলের সঙ্গে লড়াই কর্‌বে, কেন না ওদের ভেতর রজোগুণ ঠাসা রয়েছে। ওর ধর্ম্মের মর্ম্মও যে ঐরূপে আপনাদের মত বুঝ্‌বে, এতে আর বিচিত্র কি? নচেৎ সকল ধর্ম্মের মর্ম্মই এক, এবং সকল ধর্ম্ম, ত্যাগ পূর্ণজ্ঞান ও অমৃতত্ব লাভের একমাত্র পথ, এ কথা মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে।

মহাভারত ও গীতা পাঠে বুঝা যায়, কোন্‌টা কর্ম্ম, কোন্‌টা অকর্ম্ম, কি কি কাজ করা উচিত এবং কি কি উচিত নয় এবং মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য—জ্ঞান—কর্ম্মের দ্বারা লাভ হয় কি না, এই বিষয় নিয়ে যে কোন কারণেই হোক, সেই সময়ে একটা সন্দেহ উঠেছিল! সেই জন্য গীতাতে বারবার ইহা বুঝাইবার চেষ্টা যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক নয়। কর্ম্ম আশ্রয় কর্‌লে চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং তা হলে জ্ঞান আপনিই আস্‌বে। অর্জ্জুন কিন্তু ওকথা সহজে বুঝ্‌তে পারছেন না, কেবল ভুলে যাচ্ছেন। সেই জন্যে শ্রীকৃষ্ণ ফের বল্‌ছেন, সকলের এক পথ নয়। নিজের লাভ লোক্‌সানের দিকে দৃষ্টি না রেখে কর্ত্তব্য বোধে সংসারের যাবতীয় কাজই কর, অথবা কামকাঞ্চন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন কাটাও, উভয় পথের ফল একই হবে। কারণ,

উভয় পথই মানুষকে ত্যাগ শিক্ষা দিচ্ছে এবং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই ধর্ম্মলাভের একমাত্র পথ।

ভোগ সুখের জন্যে অনুষ্ঠিত সাংসারিক কর্ম্মও মানুষকে ধীরে ধীরে ত্যাগ শিক্ষা দেয়। সাংখ্যকার মহামুনি কপিল বলেন, পুরুষকে স্বমহিমা অনুভব করিয়ে দেবার জন্যই প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টিরূপ বিচিত্র উদ্যম। ভোগ সুখের দ্বারা আপনার তৃপ্তি সাধন করতে গিয়ে ধাক্কার ওপর ধাক্কা খেয়ে মানুষ, জীবনের প্রতিদিন কেমন ধীরে ধীরে অনিত্য সুখের ওপর বিরক্ত হয় ও ত্যাগ শিক্ষা করে, তা ভাবলে ওকথা ধ্রুব সত্য বলে বোধ হয়। আবার ছেলেকে ভুলিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর মত মানুষের চোখের ওপর নাম, রূপ, যশ, প্রভুত্ব বা অন্য কোন একটা অনিত্য পদার্থবিশেষকে অতিরঞ্জিত করে ধরে তাইতেই সুখ শান্তি, তল্লাভেই পুরুষার্থ, এই বুঝিয়ে কেমন সহজ উপায়ে প্রকৃতি তাকে অন্যান্য অনিত্য পদার্থ সকলের তুচ্ছতা অনুভব করিয়ে দেয়।

মনে কর, একজন ভাবলে, আমি বড় লোক হব। প্রথমে বুঝলে, বড় লোক মানে টাকা হবে, দশ জন লোক বশে থাকবে ইত্যাদি। অনেক পরিশ্রমে ধনী হল, বুদ্ধিশুদ্ধিও একটু মার্জ্জিত হল, কিন্তু ধনী

হবার পর দেখ্‌লে, বিদ্বান্ হওয়া আরও বড়। তখন একটু এগিয়ে গিয়ে বুঝ্‌লে, ঠিক বড় হতে গেলে আরও কিছু ত্যাগ স্বীকার চাই। কেন না, বিদ্যা শেখা দরকার, নচেৎ লোকে বড় লোক বলে মান্‌বে কেন? বিদ্যা শিখ্‌তে গেলে কাজেই পাঁচজনকে নিয়ে বৃথা আমোদ প্রমোদ, আপাতমধুর নানাপ্রকার সুখসম্ভোগ ইত্যাদি হতে আপনাকে পৃথক্ রাখ্‌তে হল। এইরূপে বড়লোক কথাটার মানে যত বুঝ্‌তে লাগ্‌ল, তত ধীরে ধীরে তার ধারণা হতে লাগ্‌ল যে, ত্যাগ-স্বীকার না করলে উচ্চ হওয়া যায় না। মানুষ এইরূপে সকল বিষয়ে বোঝে যে, ত্যাগ স্বীকার না করলে কিছুই লাভ হয় না। শাস্ত্র বল্‌ছেন, ছোট-খাট বিষয়গুলিতে এইরূপে অল্প অল্প ত্যাগ কর্‌তে শিখে অবশেষে মানুষ পূর্ণ ত্যাগ করে অমৃতত্ব পর্যন্ত লাভ করে।

কর্ম্মের দ্বারা মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই উচ্চতর মহত্ত্বের আদর্শ তার মন বুঝ্‌তে ও ধর্‌তে পারে। তা লাভ করতে অন্যান্য সামান্য বিষয় ত্যাগ করা আবশ্যক দেখে সে সেগুলি ত্যাগ করে ফেলে। বিবেকানন্দ স্বামিজীর একটি উপমা এখানে বেশ খাটে —আমরা সূর্য্যকে এখান থেকে দেখ্‌ছি, একটি থালার

মত। হাজার মাইল এগিয়ে যাও, সেই সূর্য্যই কত বড় দেখাবে। আরও হাজার মাইল যাও, আরও বড় দেখাবে। কিন্তু তোমার বোধ থাক্‌বে, এ সূর্য্য সেই। তেমনি আদর্শ এগিয়ে এগিয়ে ভগবানে পৌঁছুবে অথচ আমাদের বোধ হবে, আমরা একটা আদর্শই চিরকাল ধরে আছি। পরমহংসদেব বলতেন, মানুষ যদি একটা বিষয় ঠিক ঠিক করে ধরে, তা হলে তাতেই শেষে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ দেখ্‌তে পারে।

গীতায় বল্‌ছেন, যোগ ও ভোগ, কর্ম্ম ও সন্ন্যাস, মানুষের নিজের অবস্থা ভেদে সত্য ও অসত্য, লাভের বিষয় বা ত্যাগের বিষয়, এই ভাবে অনুভূত হয়। অর্থাৎ কারও মনে যোগই ঠিক আবার কারও মনে ভোগই ঠিক বলে ধারণা হয়। দেখা যায়, কর্ম্ম সকলের সমান নয়। সাধারণ মানবের কর্ম্ম আপনার সুখ বিলাস এবং স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনে আবদ্ধ। তা হতে যে একটু উঁচু হয়েছে, সে নিজের দেশের জন্যে ভাবে। কিসে দেশের লোক খেতে পাবে, কেমন করে তাদের লেখা পড়া শেখ্‌বার সুবিধা হবে, কেমন করে তারা পৃথিবীর অপর জাতের সঙ্গে সমান হয়ে চল্‌তে পার্‌বে, এই সব চিন্তায় ব্যাকুল হয়; তার চেয়ে যারা বড় হয়েছে, তারা ভাবে কেমন করে দেশের লোক সত্য পথে থাক্‌বে, সংযমী

হবে, অপরের ওপর বিনা কারণে অন্যায় অত্যাচার না করে দয়ার চক্ষে দেখ্‌বে ইত্যাদি। কেন না, তারা দেখ্‌তে পায় ঐ সব দোষ এলে পরেই জাতটার পতন হবে। আবার তার চেয়ে যে বড়, তার কর্ম্ম জগদ্ব্যাপী। সকল কালের সকল দেশের সকল অবস্থাপন্ন মানবের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাঁরা সেই ধ্যানে মগ্ন; যেমন অবতারেরা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, সাংখ্য ও যোগ তফাৎ নয়, মূর্খেরাই আলাদা মনে করে। হে অর্জ্জুন, যখন তুমি এখনও এত উচ্চ অধিকারী হওনি যে, একেবারে কর্ম্ম ছেড়ে দিতে পার, তখন কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য লাভ কর্‌তে হবে, নিজের লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে যার চিত্ত একেবারে স্বার্থগন্ধহীন হয়ে গেছে, তারই ধ্যানাদি দ্বারা সমাধি লাভ করা ছাড়া সাধারণ মানবের ন্যায় কাজ করায় কিছু লাভ নেই। সেই তখন নিজের মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ক্রমবিকাশের স্রোতে সাধারণ মানব-প্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘন করেছে। অতএব তার পক্ষে তখন অন্যরূপ ব্যবস্থা, এই বুঝে কাজ করে যাও।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপে কর্ম্মের চরম পরিণাম অকর্ম্ম বা কর্ম্মরহিতাবস্থা, শাস্ত্রের

এই কথা না বোঝায় এক বিষময় ফল হয়েছিল। যত ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও অজ্ঞ লোকেরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে বড়লোক হতে বসেছিল। অমুক কর্ম্মী, এ কথা বল্‌লে লোকে নাক সেঁটকাত বা তাকে দয়ার চক্ষে দেখে বলত, 'এখনও বুঝতে পারেনি, ধীরে ধীরে বুঝ্‌তে পার্‌বে, কর্ম্ম না ছাড়্‌লে কিছু হবে না' ইত্যাদি।

মানুষের এই রকম ভুল সকল দেশেই সকল সময়েই হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বড় বলছেন অথচ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই জ্ঞানশূন্যা বা অহেতুকী ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়, এ কথাও বলেছেন। সে কথাটি ভুলে যাওয়ায় আজকালকার বৈষ্ণব বাবাজীদের দুর্দ্দশা দেখ। সকলেই একেবারে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি লাভ করবে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে করে, সে যেন তাদের চোখে বড় কুকাজ কর্‌ছে। সকলেই একেবারে বড় লোক হবে। বড় লোক হতে গেলে যে কত 'কাঠ খড় পোড়াতে হয়' কত স্বার্থ-ত্যাগ ও উদ্যম কর্‌তে হয়, তা কেউ কর্‌বে না। একটা গল্প মনে পড়ে,—একজন লোক এক সন্ন্যাসীর মঠে গিয়ে এক সাধুকে বল্‌লে, "মহারাজ, আমায় চেলা বানিয়ে নিন্।" মঠের লোকেরা জিজ্ঞাসা কর্‌লে,

"তুমি পারবে? চেলা হওয়া বড় শক্ত। মঠের ঠাকুরজীর ভোগ রাঁধ্‌তে হবে, হাণ্ডা মল্‌তে (মাজ্‌তে) হবে, জল তুলতে হবে, সাধুদের ফাই ফরমাস খাট্‌তে হবে, গুরু যা বলে দেবেন, সে পড়া মুখস্থ করতে হবে, তাঁর সব কথা শুনতে হবে ও সন্ধ্যার পর তাঁর পদসেবা কর্‌তে হবে।" সে দেখ্‌লে বিষম মুস্কিল। ভেবে চিন্তে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা গুরু যিনি হবেন, তাঁকে কি করতে হবে?" তারা বল্‌লে, "গুরু!—জপধ্যান্ পূজাদি করবেন, চেলাদের শিক্ষা দেবেন ও তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন।" তখন সে বল্‌লে, "তবে মহারাজ! আমাকে একেবারে গুরুই বানিয়ে নিন্।" আমাদের দেশে এখন এই ভাবটা বড় বেশী। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই আমাদের শোনাতেন, "গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক।" এ ভাবটা যে গৃহস্থের ভেতর বেশী, আর সন্ন্যাসীর ভেতর কম, তাও নয়। লোকে মনে করে, সন্ন্যাসী হয়ে গেরুয়া কাপড় পর্‌লেই আর কর্ম্ম থাকে না, একেবারে জ্ঞানী হয়ে যায়। তা নয়। গীতাকার বলেন,

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥'

সর্ব্বদা কর্ম্ম কর্‌লে আত্মাকে সাক্ষাৎ দেখার দরুণ

যাঁর সর্ব্বদা সকল অবস্থায় এই জ্ঞান ঠিক ঠিক থাকে যে, আমি কিছুই করি না, আমি আত্মা, আর আত্মাকে না দেখে জ্ঞানীর ভান করে অলস হয়ে বসে থাক্‌লে যিনি দেখেন যে, বিষয় চিন্তারূপ যত কর্ম্ম সব করা হচ্ছে, মানুষের ভেতর তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম্ম যেমন করে করা উচিত, ঠিক সেই রকম করে কর্‌তে পারেন। তাঁর ভেতরই গীতাকারের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন কর্ম্ম উদ্যমের ভেতর যোগীর অবিরাম শান্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যিনি ঠিক ঠিক জ্ঞানী বা ঠিক ঠিক ভক্ত হয়েছেন, তাঁর ঐরূপ হয়। তিনিই কর্ম্ম কর্‌বার সময়েও আপনাকে তা থেকে আলাদা দেখ্‌তে পান। তিনি যেন পাকা নারকেল, ভেতরে খোলা থেকে শাঁস আলাদা হয়ে গেছে, নাড়, খট্ খট্ করে আওয়াজ হবে, আর আমরা যেন ডাব,—খোলাতে শাঁসেতে এক সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি। খোলায় আঘাত লাগ্‌লে শাঁসেও গিয়ে লাগে। কর্ম্মযোগ কর্‌তে কর্‌তে মানুষ পেকে যায়। পাকা নারকেলের মত তার ভেতরে খোলা ও শাঁস ছেড়ে যায়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রভৃতি হতে তার আত্মা আলাদা হয়ে গিয়ে আপনাতে আপনি থাক্‌তে পারে।

ঐ সব বাইরের জিনিষগুলো ছেড়ে দিয়ে তার আত্মা

আলাদা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জেগে থাকবার সময় তো কথাই নেই, ঘুমোবার সময়ও সে আপনার শরীরটাকে দেখে যেন আর একটা কার শরীর, যেন অপর একজন কেউ ঘুমোচ্ছে। সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামপ্রসাদ গেয়ে গেছেন,—

"ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

তার অবস্থাও তখন ঠিক ঐরূপ হয়! আর ঐ গানের মানেও সেই ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পারে। মানুষ যত নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করে, ততই ধীরে ধীরে তার শরীরেন্দ্রিয়াদি থেকে আমি-বুদ্ধি উঠে গিয়ে আত্মায় গিয়ে দাঁড়ায় ও ঐরূপ অবস্থা লাভ হয়।

আর এক কথা এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বত্র একটা বিষয় বোঝাবার বিশেষ চেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, মুক্তি জিনিষটা কর্ম্মের দ্বারা লাভ করবার নয়। উহা 'কর্ম্মসাধ্য' নয়। গীতাকারেরও এ কথাটা ঐ ভাবে বোঝাবার চেষ্টা দেখা যায়। এর মানে কি? এ কথাটার ঠিক ঠিক মানে বোঝা দরকার। না বুঝ্‌লে বিশেষ ক্ষতি। কেন না, তা হলে কর্ম্মটাকে ছোট জিনিষ মনে হবে। মনে হবে, মুক্তির সঙ্গে ওটার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই অতএব কর্ম্ম করতেও

প্রবৃত্তি থাক্‌বে না, কর্ম্মে নিষ্ঠা আল্‌গা হয়ে যাবে। তবে এ সব বিচার শাস্ত্রে কিসের জন্য? এইটি বোঝাবার জন্য যে, কর্ম্মের দ্বারা আত্মার স্বরূপ বা স্বভাবের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, আত্মা ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, উৎপত্তি-বিনাশশূন্য, নিত্যানন্দস্বভাব। কর্ম্ম—শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদিকে বদ্‌লে দেয়। যে সব যন্ত্রের ভেতর দিয়ে আমরা আত্মা ও জগৎ দেখ্‌ছি, কর্ম্ম সেইগুলোকে ঘসে মেজে পরিষ্কার করে দেয়। ফলস্বরূপ মন বুদ্ধির ভেতর দিয়ে এতদিন যে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছিলাম, কুয়াসার ভেতর দিয়ে দেখার মত এতদিন যে ছোট জিনিষটাকে বড় দেখাচ্ছিল বা জিনিষটার অস্তিত্বই বোধ হচ্ছিল না সেই সব ভুলগুলো ঘুচে গিয়ে যে জিনিষটা যেমন সে জিনিষটাকে ঠিক তেমনি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অতএব তাঁদের মতে কর্ম্মের ফল হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি। আত্মাটা যে ছোট ছিল, কর্ম্মের দ্বারা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল এবং অবশেষে এত বেড়ে উঠল যে, তার সব বাঁধন গুলো পটপট করে ছিঁড়ে গেল, তা নয়; কেন না, এক রকম কর্ম্মের দ্বারা আত্মাটা যদি বাড়তে পারে তা হলে আর এক রকম কর্ম্মের দ্বারা সেটা ছোট হয়ে হয়ে অবশেষে বিলকুল নাও থাকতে পারে—এইটা এসে পড়ে। এই জন্য তাঁরা বলেন যে; আত্মার মুক্তি

যদি কর্ম্মসাধ্য হয়, তবে তার অন্তও আছে। কারণ, কর্ম্ম দ্বারা যে জিনিষের উৎপত্তি হয়, তার আদিবৃদ্ধি, ও বিনাশ আছে। অতএব তাঁরা বলেন, মুক্তিটা আত্মাতে সর্ব্বদা রয়েছে, ওটা হচ্ছে তার যথার্থ স্বভাব; সেইটে ভুলে গিয়েই তার আপনাকে দেহ মন ইত্যাদি বলে মনে হচ্ছে, আর তার ফলেই আপনাকে সুখী দুঃখী বলে মনে কর্‌ছে।

যদি জিজ্ঞাসা কর, এ রকম ভুল তার কেন হল? তাতে তাঁরা বলেন, সেটা বোঝ্‌বার বা বোঝাবার কথা নয় হে বাপু—সে ভুলটা আগে গেলে তবে বোঝা বা বোঝান আসে। তোমার মনবুদ্ধির দৌড়টা ঐ ভুলের গণ্ডির ভেতর। সে জন্য সে ভুলটার কারণ মন বুদ্ধি কেমন করে জান্‌বে হে? তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, কেমন করে সে ভুলটা হল, তা হলে তাঁরা বলেন, 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানটা ঢাকা পড়েছে, সেই জন্য এই কষ্ট। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে উপায়? তা হলে তাঁরা বলেন, হাঁ, সেটার একটা উপায় ঠাউরিছি। সুখ দুঃখ, লাভ লোকসানের দিকে নজর না দিয়ে সৎ কাজগুলো করে যাও দেখি। তা হলেই এই অজ্ঞানের জড় অহঙ্কারটা নষ্ট হয়ে যাবে; আর 'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি

বিন্দতি।' এইরূপে কাজ কর্‌তে কর্‌তে পূর্ণভাবে নিষ্কাম হলেই সে জ্ঞান আপনা আপনি এসে পড়্‌বে। তা হলেই ভ্রমটা ঘুচে যাবে। তখন শরীর মন যে আর কাজ করবে না, তা নয়, ঈশ্বরেচ্ছায় আরও ভাল করে কাজ কর্‌বে। তখন বুঝ্‌বে, কখন বা কর্ম্ম করা দরকার আবার কখন বা চুপ করে থাকা দরকার। আরও *বুঝ্‌বে কর্ম্মই বা কি আর কর্ম্ম থেকে বিরত হয়ে ঠিক ঠিক চুপ করে থাকাটাই বা কাকে বলে।* তখনি মানুষের কাজ করা বা না করা এ দুটো ক্ষমতাই আস্‌বে। সাধারণ মানুষের তা নেই। সে কেবল কাজ কর্‌তে জানে। এক দণ্ডও কাজ না করে চুপ করে থাক্‌তে জানে না। কাজ যেন ভূতের মত তার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এইরূপে কর্ম্মের অধীন হয়ে সে এমন জড়িয়ে পড়ে যে, বিশ্রাম বা মুক্তির ভাবটা তার নজর থেকে একেবারে উড়ে যায়। মর্‌বার আর অবসর পায় না। ইহাই বিপদ্‌। যদি বল কেন? কোন কাজ না করে কি আমরা স্থির হয়ে কখন কখন বসে থাকি না, বা রাত্রিকালে ঘুমোই না? তখন আর কি কাজ করে ঘুরে বেড়াই? গীতাকার বলেন, হাঁ, ঘুরে বেড়াও না সত্য, কিন্তু তা বলে কি কাজ করা একেবারে বন্ধ দাও? চিন্তা, ভাবনা বা

স্বপ্ন এগুলোও যে কর্ম্ম। তারপর নিঃশ্বাস ফেলা, হৃদয়স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি কাজগুলো তো হতেই থাকে। তবে আর একেবারে কাজ থেকে বিরত হলে কি করে? ওকথা কোন কাজের কথা নয় হে বাপু। তুমি কর্ম্মের দাস—একেবারে পরাধীন। ভুলে মনে কর্‌ছ, আমি স্বাধীন, আমি কাজ কর্‌লেও কর্‌তে পারি, না কর্‌লেও কর্‌তে পারি; বিরাম কাকে বলে, তার কিছুই বোঝ না এবং একটু আধটু বুঝ্‌লেও তোমার তা কর্‌বার শক্তি নেই। যদি বিরাম কথাটার যথার্থ মানে বুঝ্‌তে চাও, তা হলে নিজের লাভ লোকসানটা আজ থেকে আর না খুঁজে—কর্‌তে হয় তাই কর্‌ছ—বলে সব কাজগুলো করে যাও। তা হলেই কালে বুঝ্‌তে পারবে, এই রকমে কাজ করার নামই হচ্ছে কর্ম্মযোগ। যে কাজগুলো কর্‌তে কর্‌তে লোকের নানাপ্রকার বন্ধন আসছে, সেইগুলোকে এমন ভাবে করা যে, যা কিছু শুন্‌ছ, যা কিছু বলছ, যা কিছু কর্‌ছ, সেই সমুদয় কাজগুলো তোমায় আর জড়িয়ে না ফেলে কর্ম্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেবে।

কর্ম্মযোগ ব্যাপারটা কি? না, কর্ম্ম করবার এইরূপ কৌশল।—'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'—এমন কৌশলে কর্ম্ম করা যায় যে, কাজ করে আর জড়িয়ে পড়্‌তে

না হয়; যাতে আমাদের ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারি। কি করলে তেমন করে কাজ করা যায়? নিজের লাভের দিকে দৃষ্টি না রাখলে। যেখানেই স্বার্থ, সেইখানেই ফলের আশা আর সেইখানেই আসক্তি এসে পড়ে। তুমি কাজ কর কিন্তু দেখো, কাজ যেন তোমায় না পেয়ে বসে। নতুবা কাজ ত করতেই হবে। পিতামাতার সেবা করতে হবে, যদি বিবাহিত হও তো স্ত্রীপুত্রদের পালন করতে হবে। যে সমাজে আছ, তার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, যে দেশে জন্মেছ, তার প্রতি কর্ত্তব্য আছে; সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রতি কর্ত্তব্য আছে। শাস্ত্র বলেন, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়।

কাজ করতেই হবে। তবে পরমহংসদেব যেমন বলতেন, সেই ভাবে কাজগুলো কর। মনে কর, যেন বড় লোকের বাড়ীর চাকরাণী। সে কাজ কর্ম্ম করছে, ছেলেদের খাওয়াচ্ছে দাওয়াচ্ছে, তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হচ্ছে কিন্তু মনে মনে জানে, আমি এদের কেউ নই। মনিব যে দিন ইচ্ছে করবে, সেই দিনই তাড়িয়ে দেবে। তুমিও সংসারে এই ভাবে থেকো।

অর্জ্জন যতদিন রাজত্ব ভোগ, লড়াই দাঙ্গা প্রভৃতি তাঁর জীবনের সব কাজগুলো এই ভাবে করে আসছিলেন,

ততদিন তাঁর বুদ্ধি পরিষ্কার ছিল। ভালবাসার মোহে পড়ে ততদিন তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায় নি। ক্ষত্রিয় জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য—সত্যনিষ্ঠা, অন্যায় অত্যাচারের দণ্ডবিধান করে ন্যায় বিচার স্থাপন, ধর্ম্মের উচ্চভাব আপনার হৃদয়ে পোষণ করে অপরকে তাতে প্রবৃত্ত করান, শরণাগতকে শরণদান, দুর্ব্বল শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও দয়াভাব, আপনার আত্মীয় কুটুম্ব বা ভালবাসার পাত্রও অন্যায় অধর্ম্ম করলে তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ইত্যাদি—এতদিন বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছিলেন। মনে করেছিলেন, এ ত খুব সোজা। এই ভাবেই চিরদিন কাজ করে যাবেন। কিন্তু মায়ার বিষম প্রতাপ! হঠাৎ একদিন কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাভিনয়ের আড়ম্বর উদ্যোগ, জীবনের পরিবর্ত্তনসঙ্কুল পরীক্ষার দিন সাম্‌নে উপস্থিত। দেখ্‌লেন, ঘটনা স্রোতে আপনি একদিকে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, ছাড়্‌বার পথ নেই! ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, বিচার সব তাঁর দিকে। অমিতপ্রজ্ঞ ধর্ম্মবন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিকে, নেই কেবল তাঁরা, যাঁদের জীবনের কিশোর কাল হতে শ্রদ্ধাভক্তি করে এসেছেন, ভালবেসেছেন, হৃদয়ের কোমল ভাবগুলো দিয়ে এসেছেন। নেই কেবল তাঁরা, যাঁদের হাত থেকে এমন অত্যাচার, অবিচার, অধর্ম্ম, নৃশংসতা

পাবার প্রত্যাশা মানুষ স্বপ্নেও করে না। আবার তাঁরা যে কেবল তাঁর দিকে নেই, তাও নয়, তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এত সাধের ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, জীবনের উচ্চ আদর্শ যদি রক্ষা করতে হয়—ত তাঁদের হত্যা করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। দেখলেন,—তাঁদের হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতধারায় তর্পণ ভিন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠা-দেবী প্রসন্না হচ্ছেন না। অর্জ্জুনের বীর হৃদয় সে ছবি স্থির হয়ে দেখতে পারলে না। ভেতরে সহস্র সহস্র বিপরীত ভাবের প্রবল তরঙ্গ সমূহ এককালে ছুটাছুটি করে আবর্ত্তসঙ্কুল করে ফেললে। ভালবাসায় মোহ এল। মোহ, ধর্ম্মভাবের উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ ডুবিয়ে ফেললে। কাজেই বুদ্ধি আর দিঙ্‌নির্ণয়ে সমর্থ না হয়ে আবর্ত্তের ভেতর নৌকা চালিয়ে অসহায় হয়ে পড়ল। তখন স্বার্থ এল। মান অপমানের চিন্তা, জয় পরাজয়ের ভয় ও ভাবনা সব একে একে এসে বললে, "পালাও পালাও, এ ত ধর্ম্ম নয়, এ যে অধর্ম্ম করতে বসেছ। কাদের সঙ্গে লড়াই করতে কোমর বেঁধেছ? এদের সঙ্গে পারবেই বা কেমন করে? ঐ দেখ ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, ঐ দেখ গুরু দ্রোণ, ঐ দেখ বিচিত্রকবচকুণ্ডলধারী, একঘাতী অস্ত্রসহায় কর্ণ, ঐ দেখ অমর, কৃপ ও অশ্বত্থামা, ঐ দেখ পিতৃবরদর্পী সিন্ধু-রাজ জয়দ্রথ—এদের সঙ্গে পারবে? এতটুকু জমির

জন্যে এত বড় বিশ্বব্যাপী নামটা কি খোয়াবে? পালাও পালাও, ভিক্ষা করে খাও, সেও ভাল। আর যদি জেত ও তো এদের মেরে, সে রাজ্যভোগ কি সুখের হবে?" অর্জ্জুন যে ধর্ম্মের জন্যে, সত্য বিচারের জন্যে, লড়াই কর্‌তে দাঁড়িয়েছেন, সে কথা ভুলে গেলেন। সব কালেই জীবনের এইরূপ স্থলে মানুষের এমনি হয়। উদ্দেশ্য ভুলে স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটি বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন;—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সাম্মহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

রূপ রসাদি ভাব্‌তে ভাব্‌তে কোন জিনিষটা প্রথমে মানুষের মনে ভাল লাগে ও মন সেই দিকে ঢলে পড়ে, biassed হয়। অমনি কামের উদয় অর্থাৎ ঐটে আমার হোক, এইরূপ ইচ্ছা হয়ে সেইটে ধর্‌তে এগিয়ে যায়। ওতে বাধা পেলেই বিরক্তি আসে। বিরক্তির পরিণাম ক্রোধ। তার বশীভূত হয়ে সে সেই বাধাটা দূর করতে চেষ্টা করে। তার পরিণামে মোহ আসে। মোহ এলে 'সত্যপথে চলব, ধর্ম্মপথে থাকব' ইত্যাদি উচ্চ উদ্দেশ্যগুলি ভুলে যায়। এরই নাম স্মৃতির

লোপ হওয়া। তখন ন্যায়ে হোক অন্যায়ে হোক সে জিনিষটা মানুষ লাভ করতে ছোটে। [illegible] উপদেশ প্রভৃতি এতদিন যা তাকে মন্দ কাজ, পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল, সে সব ভুলে যায়। ফলে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় ও পাপ কাজ করে অশেষ প্রকারে কষ্ট পায়।

মনে কর, কেউ অর্থ উপার্জ্জন করতে চায়, দেশের উপকার করবে বলে। প্রথম প্রথম ঐ ভাব বেশ প্রবল থাকে। কিন্তু টাকা হাতে এলে টাকার প্রতি মায়া হয় এবং ক্রমে অর্থ লালসায় উদ্দেশ্য ভুলে নিজের সুখবিলাস অথবা কাঞ্চনকেই জীবনের লক্ষ্য করে চলে। সেই জন্য উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে হয়, ফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না; এই হচ্ছে কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগী কে হতে পারে? যে আপনাকে বশ করতে পেরেছে, আপনার ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করেছে; জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য যার অবিচলিত আছে, কাজ যাকে না চালিয়ে যে কাজকে চালায় সেই কর্ম্মযোগী হতে পারে। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে সে বুঝতে পারে, আমার কাজ ফুরিয়েছে এবং কাজ থেকে অবসর নেয়।

গীতায় তাই শিক্ষা দিচ্ছেন, কাজ কর। কাজ না করার চেয়ে কাজ করা ভাল। কিন্তু কাজ করতে

গিয়ে ফলকামনা করো না। ফলকামনা এলেই বাঁধা পড়্‌তে হবে! দেখ্‌তে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে যারা কোন বড় কাজ করেছে, তারা সকলেই সংযমী পুরুষ, আপনার উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। ছাত্রজীবনে কে বড় হয়? যে পাঁচটা আমোদে না মেতে উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। সংসারে কে বড় হয়?—ধর্ম্মে কে বড় হয়?—যে উদ্দেশ্য ঠিক রাখ্‌তে পারে। উদ্দেশ্যহারা হলেই পড়্‌তে হবে ও তোমার দ্বারা কাজের মত কাজ আর একটাও হবে না। কেন না, তোমার বুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা নয়, তা আর ধর্‌তে পার্‌বে না। ফলে কতকগুলো বাজে কাজে ছুটো-ছুটি করে মরাই সার হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, মন থেকে একেবারে ফলকামনা যদি যায়, তা হলে কাজ কর্‌ব কেমন করে? কোন উদ্দেশ্য বিশেষ কামনা করা ভিন্ন কাজ কি করা যায়? ঠিক কথা; উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ হতে পারে না। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের দিকে যাবার সময় নিজের লাভালাভ খতাব কেন? আমরা কেবল নিজের লাভ লোক্‌সান খতাতে চাই। ওইটে আগে খতিয়ে তবে কাজে লাগি। লেখা পড়া শিখি রোজগার করতে পার্‌ব এবং নাম হবে বলে, জ্ঞানের জন্যে নয়। স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে

ভালবাসি নিজে সুখী হই বলে, তাদের জন্যে নয়। এইরূপে তলিয়ে দেখ্‌লে আমাদের সকল কাজেরই উদ্দেশ্য দেখ্‌তে পাই স্বার্থসেবা—আপনার অহঙ্কারের যোড়শো-পচারে পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমাদের মুখে একখানা থাকে আর মনে একখানা থাকে। এই ভাবের ঘরে চুরিটা প্রথমে না ঘুচ্‌লে কোন যথার্থ কাজই আমাদের দিয়ে হবে না। কোন সত্যের পথই আমাদের চোখের সাম্‌নে পড়্‌বে না। সেই জন্য গীতাকার অর্জ্জুনকে সাম্‌নে রেখে আমাদের সকলকে বল্‌ছেন, ফলকামনাই সর্ব্বনাশের মূল। ফলকামনাই তোমায় অজ্ঞানে জড়িয়ে রেখেছে, কর্ত্তব্য কর্‌তে দিচ্ছে না। চোখে ঠুলি বেঁধে সামনে সত্য থাক্‌লেও দেখ্‌তে দিচ্ছে না। ফলকামনা ছাড়, ছাড়। ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখ্‌লেই অজ্ঞান অধর্ম্মের মূল স্বার্থপরতার হাত থেকে এড়াবে। তখন ঠিক ঠিক সুখ কাকে বলে, তা বুঝ্‌বে, ঠিক ঠিক ভালবাসা কাকে বলে, তা দেখ্‌বে। ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখ্‌লেই তুমি যোগী হবে, জ্ঞানী হবে, ভক্ত হবে। তোমার সব দুঃখ দূরে যাবে।

শাস্ত্র পড় বা বক্তৃতা শোন, শাস্ত্রের কথাগুলি যদি জীবনে পরিণত করে কাজ না কর্‌তে পার, শাস্ত্র যদি জীবনে না খাটে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় সহায়

না হয়, তবে সে পড়াশুনো সব মিথ্যে। তার কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্রজীবনেই বল, সংসারে ভোগের ভেতরেই বল, আর সন্ন্যাসের ত্যাগের মধ্যেই বল, এটি কর্‌তে শেখা আগে চাই। তা হলেই মানুষ যেখানে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন, শাস্ত্রজ্ঞান জীবনের উচ্চ লক্ষ্য তার সাম্‌নে ধরে তাকে সেখান হতেই তুলে দেবে।

স্বামিজী বল্‌তেন, আমাদের দেশে এখন আর শাস্ত্র কেউ বোঝে না, কেবল ব্রহ্ম, মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি কতকগুলো কথা শিখে মাথা গুলিয়ে মরে। শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যটা ছেড়ে দিয়ে কেবল কথাগুলো নিয়ে মারামারি করে। শাস্ত্র যদি মানুষকে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সাহায্য কর্‌তে না পারেন, তা হলে সে শাস্ত্রের বড় একটা আবশ্যক নেই। শাস্ত্র যদি সন্ন্যাসীকে পথ দেখান আর গৃহীকে পথ দেখাতে না পারেন, তা হলে সে একদেশী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি দরকার? অথবা শাস্ত্র যদি মানুষ অন্য কাজ-কর্ম্ম সব ছেড়ে বনে গেলে তবে তাকে সাহায্য কর্‌তে পারেন, কিন্তু সংসারের কোলাহলের ভেতর, দিন-রাত খাটুনির ভেতর, রোগ শোক দৈন্যের ভেতর, অনুতপ্তের নিরাশার ভেতর, অত্যাচারিতের ধিক্কারের ভেতর, রণক্ষেত্রের করালতার ভেতর, কামের ভেতর, ক্রোধের

ভেতর, আনন্দের ভেতর, জয়ের উল্লাসের ভেতর, পরাজয়ের অন্ধকারের ভেতর এবং পরিশেষে মৃত্যুর কালরাত্রির ভেতর মানুষের হৃদয়ে আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে পথ দেখাতে না পারেন, তবে দুর্ব্বল মানুষের সে শাস্ত্রে কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

মনে কর, ছাত্রজীবনে জ্ঞান লাভের জন্য বা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্যে আমায় বিলেত যেতে হবে। শাস্ত্র যদি না আমায় সে সময় সে বিষয়ে সাহায্য কর্‌তে পারেন, তবে আমার দশা কি হবে? কিন্তু তলিয়ে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, আমাদের শাস্ত্রের কোন দোষ নেই, দোষ আমাদের। আমরা শাস্ত্রোপদেশ কিরূপে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় লাগাতে হয় ও লাগাতে পারা যায়, তা একেবারে ভুলে গেছি। ভুলে গিয়ে মনে কর্‌ছি, খাঁটি ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্‌তে হলে বনে যেতে হবে। গীতাকারের অন্য মত। তিনি একদিকে অর্জ্জুনকে বল্‌ছেন, ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই না কর্‌লে তোমার ধর্ম্ম লাভ কিছুতেই হবে না, আবার উদ্ধবাদি অন্য প্রকৃতির লোককে বল্‌ছেন, তোমাকে সব ছেড়ে ছুড়ে পাহাড়ে বদরিকাশ্রমে গিয়ে অনন্যমনে ধ্যান জপাদি কর্‌তে হবে। তা না হলে তোমার ধর্ম্মলাভ হবে না। অতএব শাস্ত্রের কথাই হচ্ছে এই, তুমি যেখানেই থাক,

কর্ম্মফল ছেড়ে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম্ম করলে সেখান থেকেই তোমার মুক্তি হবে।

পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে মানুষ যে কাজ করতে পারে, আমাদের চোখের সাম্নে পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দ স্বামী তাহা নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের মত শাস্ত্রের ছোবড়া নিয়ে টানাটানি করেন নি। আমাদের জীবনের সহিত শাস্ত্রোপদেশের ঐক্য চাই। তা হলেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারা যায়, তা দেখিয়ে গেছেন। কেমন করে শাস্ত্রজ্ঞান জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়, তাই শিখিয়ে গেছেন। আমাদের সেটি যত্ন করে শেখা চাই। তোমাদের সমিতিরও তাই উদ্দেশ্য, সেটা যেন কখন ভুলো না। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে ধর্ম্ম নানা ভাবে প্রকাশিত হবে, এইটি নিজে নিজে ভাল করে বুঝে জগতের সাম্নে জীবনে সেইটি দেখাতে হবে, এ কথাটা ভুলো না। শাস্ত্রের উপদেশগুলি একালেও যে জীবনে পরিণত করা যায়, আর করতে পারলে মানুষ যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, বিশেষ সাহায্য পায়, জীবন-সংগ্রামে বিশেষ জোর পায়, তা দেখাতে হবে, ভুলো না। শাস্ত্রের যদি দোষ থাকৃত বা উহা যদি একালের অনুপযোগী, সেকেলে একঘেয়ে উপদেশে পূর্ণ থাকৃত, তা হলে

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দের জীবন গঠনে কখন সহায় হতে পার্‌ত না, এটা বেশ করে বুঝো, শাস্ত্রের দোষ দিও না। দোষো আপনার চোককে, যেহেতু, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ও ঠিক ঠিক উদ্দেশ্য তার দেখ্‌বার শক্তি নেই। দোষো আপনার শিক্ষাকে, যাতে চোক, কাণ, নাক, মুখের ব্যবহার কেমন করে কর্‌তে হয়, তাও লোককে শিখতে দেয় না।

আমাদের ভেতর কটা লোক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কর্‌তে জানে? ইন্দ্রিয়কে সূক্ষ্ম জিনিষ ক্রমে ক্রমে ধর্‌তে শেখালে তবে ত তারা ধর্‌তে পার্‌বে। আজকাল আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, কেমন করে আমরা ভাল কেরাণীটি হতে পারব। নূতন নূতন ভাবে চিন্তা কর্‌তে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা কর্‌তে, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় চালনা করতে শেখান দূরে থাক্, চিন্তা কর্‌বার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে হাত পাগুলো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে জড় করে তুল্‌ছে। ইন্দ্রিয়গুলো সবল, কর্ম্মঠ হলে তবে ত সকল বিষয় উপলব্ধি কর্‌তে পারবে এবং তবেই ত জ্ঞান হবে। আমরা চাই,—অশিক্ষিত ভাঙ্গাচোরা শরীরেন্দ্রিয় দিয়ে যোগীর বহুকালের শিক্ষিত সতেজ অথচ বশীভূত ইন্দ্রিয় মনের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সব একদিনে

অনুভব করব। আরে পাগল, তাও কি কখন হয়? আগে ইন্দ্রিয়গুলোকে সতেজ কর্, শিক্ষা সহায়ে বশীভূত কর্, বহুকাল ধরে অভ্যাস কর্, শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা কর্, তবে ত পার্বি। তা করবো না, আর বলব— আমাদের শাস্ত্রটা সব আজগুবি ও মিথ্যাতে ভরা। হিন্দু ধর্ম্মটা কিছু নয়। এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? ছেলে বেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম। গল্পটির নাম—চোক থাকা ও না থাকার কত প্রভেদ। গল্পটি এই—দুজন লোক এক মাঠের ওপর দিয়ে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল। একজন সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বিশেষ কিছু না দেখ্তে পেয়ে মহা বিরক্ত হয়ে ফিরে এল। আর তার সঙ্গী কত কি নূতন নূতন গাছ গাছড়া সংগ্রহ করে জমিটার উর্ব্বরতা পরীক্ষা করে নানা রকমের নূতন পাথরে জামার পকেট পুরে মহা আনন্দে ফিরে এল। দুজনে এক মাঠেই বেড়াতে গিছ্লো। কিন্তু শেষের লোকটি চোখের ব্যবহার জান্ত, এই প্রভেদ। স্বামিজীর সহিত যারা বেড়িয়েছে, তারা জানে, তাঁর কিরূপ দৃষ্টি ও ধারণা ছিল। কতবার দেখেছি, একই দেশের ভেতর দিয়ে, একই স্থানে বাস করে, এক সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম। তিনি এসে তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার ইতিহাসাদির কত কথা

বলতে লাগলেন। আমরা শুনে অবাক্ হয়ে ভাব্তে লাগ্লুম, ইনি এত কখন দেখলেন বা শুনলেন।

শাস্ত্র বলেন, দৃঢ় শরীর, সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম, ধারণা সমর্থ মনবিশিষ্ট পুরুষই বেদজ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। সে পুরুষ এখন কোথায়? [illegible] লোকের ভেতর এত্ত যে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চুপ করে পড়ে থাকা দেখ্তে পাও, সবটা কি মনে কর, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম্ম বিশ্বাস থেকে আসে? তা নয়। দুর্ব্বলতা ও তমোগুণই হচ্ছে তার প্রধান কারণ। অদৃষ্ট বা দৈব মানুষকে সহায়তা না করলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু গীতাকার বলেন, কার্য্য সিদ্ধি হবার পাঁচটা কারণের ভেতর দৈবটা একটা কারণ মাত্র। দৈব সহায় না হলে যেমন কোন কাজ সফল হয় না, সেইরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে চাই, "অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধং। বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টাঃ।" উপযুক্ত দেশ কাল, উদ্যমশীল কর্ত্তা, সতেজ শিক্ষিত ইন্দ্রিয়গ্রাম ও তৎসহায়ে বার বার নূতন নূতন উপায়ে কর্ত্তার উদ্যম করা। শাস্ত্র বলেছে, দৈবসহায় ভিন্ন কোন কাজ হয় না। সেটি আমরা বেশ করে ধরে বসে আছি, কিন্তু শাস্ত্র যে তা ছাড়া আরও বল্ছেন, সবল হও, অনলস হও, ক্রমাগত চেষ্টা কর, কার্য্য কর, সেগুলো আমরা শুনেও শুন্‌ব

না, দেখেও দেখ্‌ব না। কেননা, তা যে আমাদের বিল্‌কুল নেই, আমরা যে মহা তমোগুণে পড়ে রয়েছি।

কাজের আগ্রহ চাই, তার ওপর দৈব চাই। দুটোরই দরকার। তবে ফলসিদ্ধি হয়। তোমার হাতে আছে উদ্যমী হওয়া, অনলস হওয়া, ফলসিদ্ধি তোমার হাতে নেই, তোমার দেখ্‌বার দরকারও নেই। তোমায় দেখ্‌তে হবে, উদ্দেশ্যটা ঠিক রাখ্‌তে পেরেছ কি না। কর্ম্মযোগে গীতাকার এইটি হতে তোমায় শিক্ষা দিচ্ছেন।

কর্ম্মযোগের আর একটি উদ্দেশ্য আছে,—শক্তিক্ষয় নিবারণ করা। যোগ হচ্ছে,—কর্ম্ম কর্‌বার কৌশল। কর্ম্মবিশেষে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা দরকার, ততটুকু তাতে লাগান, অল্পও নয়, অধিকও নয়। ফলকামনা না কর্‌লে সেইটি হয়। মনে কর, ফলের দিকে মন দিয়ে যদি অকৃতকার্য্য হল, তা হলে মনস্তাপে তোমার কত শক্তি ক্ষয় হল। কর্ম্মযোগ বল্‌ছে, শক্তিক্ষয় করো না। শক্তি সঞ্চয় কর এবং শারীরিক শক্তির সার ভাগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর। সংযম ও কর্ম্মযোগের এই শিক্ষা। যতটুকু শক্তি প্রয়োগ দরকার, ততটুকু কাজে লাগাও। তোমার

যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, ততটুকু করেছ কি না, সর্ব্বদা দেখো। কিন্তু যেটা তোমার হাতে নেই, সেটার জন্য মাথা খুঁড়ে হা হুতাশ করে শক্তিক্ষয় করো না। ভোগী, ফলকামী পুরুষের শক্তি সর্ব্বদাই ঐরূপে ক্ষয় হয়। কাজেই কর্ম্ম কর্‌বার শক্তিও তার দিন দিন কমে যায়। সেই জন্য কেবল উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে কাজ করে চলে যাও।

ঐরূপে কাজ কর্‌বার উপযুক্ত কে? যে আপনার মনটাকে বশ কর্‌তে পেরেছে। ঐরূপে কাজ করে গেলে কি হয়? কর্ম্মবন্ধন কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণ জ্ঞান-লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিশেষ রূপে দেখা যায়। দেখা যায়, তাঁর ইন্দ্রিয় মন সর্ব্বদা অশেষ কাজ কর্‌লেও তিনি অল্পমাত্রও ফলাকাঙ্ক্ষী নন। তাঁর ন্যায় অবতারেরাই জগতের যথার্থ গুরু। তাঁদের জীবনই জ্ঞানের বিস্তারের জন্য, লোকের শিক্ষার জন্য। তাঁদের জীবন দেখে ঐ ভাবে কাজ কর্‌তে শেখ। নতুবা সংযম কর্‌তে না শিখ্‌লে, ফলাকাঙ্ক্ষায় কাজে প্রবৃত্ত হলে, মন ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়্‌বে এবং ঐ ইন্দ্রিয়ই আমাদের মাটি কর্‌বে। ইন্দ্রিয়ের দাস হলে চল্‌বে না, কাজ হবে না, উদ্দেশ্য হারাতে হবে। ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখ্‌তে

হবে। মহান্ উদ্দেশ্য সাম্‌নে রেখে নিষ্কাম হয়ে কাজ করে যাও। দেখ্‌বে, জ্ঞানযোগী তীব্র বৈরাগ্য সহায়ে যে অবস্থা লাভ করেন, কর্ম্মযোগী কর্ম্মের দ্বারা ঠিক সেই অবস্থায় পৌঁছুবেন। দুজনেরই উদ্দেশ্য এক কিন্তু পথ আলাদা। পথে যতক্ষণ, ততক্ষণ উভয়ের মিল না থাক্‌লেও উদ্দেশ্যে পৌঁছুলে আর বিরোধ থাকে না।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

(১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে জানুয়ারী, কলিকাতা বিবেকানন্দসমিতিতে বক্তৃতার সারাংশ)

..কর্ম্মযোগ বলে, মানুষকে কর্ম্ম কর্‌তেই হবে। কর্ম্ম ছেড়ে কখনই থাক্‌তে পার্‌বে না। যতদিন শরীর থাক্‌বে, মৃত্যু না হবে, ততদিন কোন না কোন, কিছু না কিছু কাজ কর্‌তেই হবে। মানুষের পক্ষে কাজ ছাড়া অসম্ভব।

আবার অন্যদিকে শাস্ত্র বল্‌ছেন, "সমস্ত কাজ যতদিন না ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে, ততদিন মানুষের জ্ঞানলাভ ও মুক্তি অনেক দূরে।"

সাধারণ ভাবে দেখ্‌লে দুটি কথা বড়ই বিপরীত। সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন। তাই, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ উপদেশ করে ঐ দুই বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা করে দিচ্ছেন; বল্‌ছেন—সম্পূর্ণ কর্ম্মরহিত

অবস্থায় না পৌঁছুলে জ্ঞানও হবে না, শান্তিও পাবে না, সেটা ঠিক; কিন্তু সে অবস্থাটা হাত পা গুটিয়ে বসে থাক্‌লেই যে হল, তা নয়। তাতে বরং তোমায় কপটাচারী করে তুল্‌বে। সে অবস্থাটা লাভ হলে শরীরেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ কর্‌লেও তোমার ভেতরে "আমি কর্ম্মরহিত—শরীরেন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্"—এই ভাবটি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাক্‌বে। এমন কৌশলে কাজ করা যায়, যাতে কাজ কর্‌তে কর্‌তে ধীরে ধীরে মানুষ ঐ অবস্থায় পৌঁছায়। অতএব কর্ম্মযোগের মূল-মন্ত্রই হচ্ছে—কর্ম্মের ভেতরে থেকেও আপনাকে কর্ম্মরহিত করে রাখতে শেখা।

শরীর মনের দ্বারা নিয়ত কাজ চল্‌বে অথচ নিজে কর্ম্মরহিত হয়ে থাক্‌তে হবে—এইটাই হচ্ছে ঠিক অকর্ম্ম বা কর্ম্মরহিতাবস্থা। হাত পা গুটিয়ে বসে আছি অথচ মনে মনে নানারকমে "লঙ্কাভাগ" কচ্ছি—সেটা কর্ম্ম-রহিত হয়ে থাকা নয়। ঠিক্ ঠিক্ কর্ম্মরহিত হয়ে যিনি থাক্‌তে পারেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "তিনি মানুষের ভেতর বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তাঁর দ্বারাই সব কাজ ঠিক্ ঠিক্ সম্পন্ন হয়।" যথা—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

কর্ম্মের ভেতর থেকে যিনি আপনাকে কর্ম্মরহিত দেখতে পান আর অলস হয়ে কতক কর্ম্ম ছেড়ে থাকলে কর্ম্মরহিত হওয়া অনেক দূর, একথাও যিনি বোঝেন, মানুষের ভেতর তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কাজ যথাযথ করতে পারেন।

অতএব শরীর মন প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত রাখ্‌তে হবে; আবার সেই সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ কর্ম্মরহিত জেনে ভেতরে যোগীর অবিরাম শান্তি নিয়ত প্রবাহিত রাখ্‌তে হবে। এইরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে স্থাপিত হবে। মুক্ত পুরুষের এই ভাবটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হলেও সাধককে অনেক যত্নে অনেক উদ্যমে সুখদুঃখজড়িত অনেক কর্ম্মের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থা লাভ কর্‌তে হয়।

কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য স্থাপনই গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের বিশেষ লক্ষ্য। পূর্ব্বে বলেছি, গীতাকারের সময়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধ সাধারণ ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য গুলিয়ে ফেলেছিল। কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ—একটা কর্‌তে গেলে অন্যটা কখনই কর্‌তে পারা যাবে না—এইরূপ লোকে বুঝ্‌ত। এখনও যে আমাদের দেশে

অনেক বিষয়ে ঐ প্রকার ভুল ধারণা নেই, এ কথা কে বল্‌বে ? মনে কর, ধর্ম্ম কর্‌তে গেলে বনে যেতে হবে, জগতের কোন জীবের জন্য কোন কাজ কর্‌লে আর ধর্ম্ম হবে না—আমাদের ভেতর পুরানো লোকদের এই যে 'অন্ধ' বিশ্বাস ; অথবা—সংসারে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য—সংসার ছেড়ে, কর্ম্ম ছেড়ে জ্ঞানী হওয়া, সে আবার কি রকম জ্ঞান রে বাপ, সে একটা কোন রকম অস্বাভাবিক উপায়ে, মাথা বিগড়ে, জড়বৎ হয়ে যাওয়া—আমাদের সুশিক্ষিত (?) নবীন ছোকরাদের ইংরেজ গুরুর পদতলে বসে এই যে অদ্ভুত 'চক্ষুষ্মান্' বিশ্বাস হয়েছে, সে গুলিকে 'পরের মুখে ঝাল না খেয়ে,' নিজে নিজে শাস্ত্র পড়ে দেখ্‌লে কি মনে হয় ? শাস্ত্রের এই কথাটি একদল একেবারে ভুলে গেছেন যে, কর্ম্মের দ্বারা প্রথমে মন বুদ্ধি পরিষ্কার না হলে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অন্যদল একেবারে 'না পড়েই পণ্ডিত'—পরমহংসদেব যেমন বল্‌তেন, 'ও কথা খবরের কাগজে তো লেখেনি' বা ইংরাজেরা মানে না'—তবে শাস্ত্রকথিত জ্ঞানটাকে মানুষের উন্নতির চরম সীমা বলে তাঁরা কেমন করে মানেন।

শাস্ত্র বলেন, মানুষ প্রথমে বেদাভ্যাস কর্‌বে। তবে তার ধর্ম্মে নিষ্ঠা হবে। ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অতএব

ধর্ম্মলাভ কর্‌বে বলে সে নানা কাজ কর্‌বে। নানা কাজ কর্‌তে কর্‌তে তার নানা প্রকারে সুখ দুঃখ অনুভব হয়ে ধীরে ধীরে 'জগৎ অনিত্য' এই জ্ঞান হবে। তখন সে আর নিজে সুখী হব, বড় হব বলে প্রত্যেক কাজ না করে, নিষ্কাম হয়ে, কর্ত্তব্য বলে কাজ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। উহাতে ক্রমশঃ মন বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে সে নিজের লাভ লোকসান খতানটা একেবারে ছেড়ে দেবে। ইহারই নাম যথার্থ ত্যাগ। বিবেকবুদ্ধিপ্রেরিত এই ত্যাগ একবার জীবনে এলে সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বস্তুলাভের বিশেষ আগ্রহ প্রাণে উদয় হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞানও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। তখন সকল বিষয়ে সর্ব্ব প্রকারে একত্বের অনুভব হয়। ভেতরে বাহিরে সে দেখে কেবল এক—এক—এক। একবার এই একজ্ঞান হলে আর তার লোপ হয় না। মরীচিকাকে একবার বালির ওপর আলোর খেলা বলে জান্‌লে আর জল বলে বোধ হয় না।

তবে এই একজ্ঞান জীবনে অনুভব করেও কতকটা দ্বৈতবুদ্ধি, লোকশিক্ষার জন্য বা উচ্চ উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য ফের এনে কাজ করা যেতে পারে। পরমহংস-দেব বলতেন, "যেমন সুরজ্ঞ গায়ক—অনুলোম ধরে ওপর গ্রামে উঠ্‌লো, আবার বিলোম ধরে নীচের গ্রামে

াব্‌লো। যখন যে সুর ইচ্ছে গলা দিয়ে বার কর্‌লে।"
়কজ্ঞানীর কাজ করা না করা ঠিক ঐ রকম মুঠোর
ভত্তর থাকে। তবে হাজার চেষ্টা করেও তিনি আর
চখনও সাধারণ লোকের মত, কাম কাঞ্চন যশ মানাদিকে
'চিজ, বস্তু, মাল" বা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে দেখ্‌তে
পারেন না। যেমন মরীচিকাটা একবার জল নয় বলে
বোধ হলে আবার তুমি যেখানে ঐ রকম ভুল বুদ্ধি হয়,
সেখানে যেতে ও সেই ভুলটা বার বার দেখ্‌তে দেখাতে
পার, কিন্তু আর কখন ঐ জলপান করে তৃষ্ণা মেটাতে
যাবে না—সেইরূপ।

কর্ম্ম যে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, এ কথাটা মনে
না রাখ্‌তে পারলে বিষম গোল লাগ্‌বে। "জুতো সেলাই
থেকে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মই এই জ্ঞান-
লাভ রূপ উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দে
যদি নিজের লাভ লোকসানটা খতিয়ে সে উহা
না করে। ভারতে গৃহী ও সন্ন্যাসী লক্ষ লক্ষ লোক
জ্ঞানলাভের চেষ্টা কর্‌ছেন—সেটা খুবই ভাল কথা।
কিন্তু তাঁদের ভেতর পনর আনা লোকই নিজের লাভ
লোকসান খতানটা আগে না ছেড়ে আগেই কর্ম্মটাকে
মায়া বলে যতটা পারেন, ছাড়বার চেষ্টায় থাকেন।
তাতে হয় এই যে, খাওয়া, পরা ইত্যাদি স্বার্থের

জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি ঠিক বজায় থাকে ; কেবল *দান, দীন সেবা, দেশানুরাগ প্রভৃতি পরহিতের জন্য অনুষ্ঠিত কাজগুলিই আগে ত্যাগ হয়ে যায়,—কেননা* সেগুলি করায় ঢের 'বখেড়া,' 'হাঙ্গাম'। কে "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় ?" ফলে যা দেখ্‌ছি, স্বার্থপরতায় দেশ পূর্ণ হয়ে সকলেই অধঃপাতে যেতে বসেছি। বিবেকানন্দ স্বামিজী যেমন বল্‌তেন, "দেশের লোকগুলোর যোগ ত হলই না, ভোগও হল না, কেবল পরের জুতো লাথি খেয়ে কায়ক্লেশে কোনরূপে দুটো উদরান্নের সংস্থান—তা কারুর হল কারুর হল না।" ঐ সকল লোক যদি, গীতাকার যেমন বলেছেন এবং প্রতি ঘটনায় নিজের জীবনে দেখিয়েছেন, পরহিতের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য, গরিব দুঃখীর সেবা ও শিক্ষার জন্য, যার যতটুকু সাধ্য নিষ্কাম হয়ে কাজ করে যান, তাহলে জপ ধ্যানের ন্যায় ঐ সকল কাজই তাঁদের প্রত্যেককে জ্ঞানলাভের দিকে এগিয়ে দেয়, দেশেরও এমন দুরবস্থা থাকে না। দেখা যায়, একজনের স্বার্থ ত্যাগে যখন কত লোকের কল্যাণ হয় তখন যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক স্বার্থবলি দিতে কোমর বেঁধেছে, সে দেশের কখন দুরবস্থা থাকে ? অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষিতদের ভেতর, ইংরেজ গুরুর দৃষ্টান্তে

সকাম কর্ম্মে একটু আস্থা হলেও, নিষ্কাম হয়ে কাজ করা তাঁরা একেবারে বোঝেন না; এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মের উদ্দেশ্যই বা কি, তাও তাঁদের প্রাণে ঢোকে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভের দিকে তাঁদের আদৌ ঝোঁক নেই—উহা লাভ কর্‌তে উদ্যম করা যে দরকার এটাও তাঁরা বোঝেন না। বোঝেন না যে, এই জ্ঞান আমাদের ঋষিকুল হতে প্রাপ্ত বহুমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। যুগ যুগান্তরের পরাধীনতার পেষণে ভারতের বিদ্যা, ধন, মান সব গিয়েছে—আছে বাকি যেতে কেবল ঐ জ্ঞান, একজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান, যা লাভ হলে মানুষ সকল অভাবের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হয়। প্রত্যেক হিন্দুর এই জাতীয় সম্পত্তি অতি সাবধানে রক্ষা কর্‌তে হবে। ঐ জ্ঞানের যে দিন লোপ হবে, সে দিন হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, ভারতের নিজের অস্তিত্ব লোপ হবে এবং কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম সব খুইয়ে জাতটা উৎসন্ন হয়ে যাবে।

গীতোক্ত এই জ্ঞান উপলব্ধির জিনিষ। আমাদের ওঠা, বসা, নাওয়া, খাওয়া, শোয়া প্রভৃতি সকল অবস্থার ভেতর, সকল রকম কাজের ভেতর এর অনুভব চাই। তর্ক যুক্তি বা কল্পনা সহায়ে ঐ জ্ঞানের একটু আভাস পেয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। অবিদ্যা-প্রসূত কাম কাঞ্চনকে জীবনের উদ্দেশ্য কর্‌লে চল্‌বে

না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের চর্চ্চা কর্‌তে হবে। ত
তন্ময় হতে হবে, উন্মাদ হতে হবে, 'মত্ত' হয়ে যে
হবে।

কর্ম্মযোগের দ্বারা সূক্ষ্ম হলে, মার্জ্জিত হলে তবে
সে বুদ্ধিতে জ্ঞানের উপলব্ধি হবে। পরমহংসদে
বল্‌তেন, "ভগবান্ বিষয়বুদ্ধির বাইরে, কিন্তু শু
বুদ্ধির গোচর।" অতএব ফলকামনা ছেড়ে কর্ম্ম কর
হচ্ছে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; আর নিজে
লাভালাভটা যদি আমাদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য না হ
তাহলে যে কাজই করিনা কেন, তাহা দ্বারা ক্রমে জ্ঞানে
বিকাশ হবেই হবে। কর্ম্মে দোষ নেই—কখনই নেই
কিন্তু দোষ রয়েছে আমাদের ভেতরে। নিজের লাভটাকে
কর্ম্মের উদ্দেশ্য করেই আমরা দোষী হয়েছি, আপনার
জালে আপনি বাঁধা পড়েছি, এবং মুক্ত হবার "খেই
জনমের মত" হারিয়েছি। নতুবা নিজের লাভের
আশাটাকে যদি চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিয়ে স্বার্থ-
গন্ধহীন কোন মহান্ উদ্দেশ্য সাম্‌নে রেখে কাজ করে
যাই, তাহলে গীতাকার বলেন,—

"হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

নরহত্যার স্রোত বহালেও আমরা খুনে হব না
বা অপরে আমাদের খুন কর্‌লেও আমরা মরব না

—এই প্রকার অনুভব হবে। পতিব্রতা উপাখ্যান, ধর্ম্মব্যাধের কথা আমরা সকলেই মহাভারতে পড়েছি বা শুনেছি। কিন্তু সেই সকল 'আদর্শ চরিত্রের ন্যায় কাজ করতে একেবারে ভুলে গেছি। তাই এ দুর্দ্দশা! গীতাকার সেজন্যই বল্‌ছেন, "নিষ্কাম হয়ে কাজ কর, অবিরাম কাজ কর—কিন্তু কর্ম্ম করতে করতে ভেতরে কর্ম্মরহিত হয়ে থাক ও যোগীর অচল শান্তি অনুভব কর।"

কথায় বলে, মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে, তার সমস্তই এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে আছে—কিন্তু সমস্তই আছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, তার বৃহৎ প্রতিকৃতি আবার এই বহির্জগতে বর্ত্তমান। মানুষের ভেতর যেমন এই কর্ম্মের ভেতরে কর্ম্মরহিতাবস্থা রয়েছে—কেবল অনুভবের অপেক্ষা মাত্র, সেইরূপ বহির্জগতের অনবরত পরিবর্ত্তন এবং গতির মধ্যেও অচল ক্রিয়ারহিত শান্তভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান। স্থূলভাবে দেখে মনে হয়, এ আবার কি কথা। নানা ভাবে অনুক্ষণ স্পন্দনশীল জগতে আবার কোথায় কখন গতিরহিত ক্রিয়ারহিত অবস্থা দেখ্‌তে পাওয়া যায়? প্রজ্ঞাচক্ষু দার্শনিক বলেন, সুখ দুঃখ, আলো আঁধার প্রভৃতি বিপরীত দ্বন্দ্বের ন্যায়

ক্রিয়া ও ক্রিয়ারাহিত্য, গতি এবং বিশ্রামও জগতে সদা যুগপৎ বর্ত্তমান। ক্রিয়া, গতি প্রভৃতি, তদ্বিপরীত ক্রিয়ারাহিত্য, গতিরাহিত্য প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেই আমরা বুঝে থাকি। যেখানে ঐরূপ তুলনা কর্‌বার উপায় নেই, সেখানে ক্রিয়া এবং গতিও আমাদের অনুভবের, সাধ্য নেই। শুধু আমাদের অনুভব হয় না তা নয়, কিন্তু আমরা যাহাকে ক্রিয়া, গতি ইত্যাদি বলি, তা সেখানে বাস্তবিক নেই। জগতের ভেতরে নানা জিনিষের নানাভাবে অবস্থান দেখে, তুলনা করে আমাদের অনবরত গতি ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হচ্ছে; কিন্তু সমুদায় জগৎটাকে একটা পদার্থ বলে একবার ভেবে নিয়ে তার পর তাতে গতি রয়েছে ভাব দেখি। তার যো নেই। ঐখানেই শান্ত নিস্পন্দ ক্রিয়ারহিত অবস্থা। শুনে বল্‌বে হয়তো 'ওঃ, ও তো কল্পনা!' দার্শনিক হেসে বলেন, না হে, কল্পনা টল্পনা নয়—ওই ঠিক ঠিক সত্য। তোমার বিজ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি সব শাস্ত্রই তো বলে, জগৎটা একটা জিনিষ; এক বৈ দুই পদার্থ নেই—এক বৈ দুই শক্তি নেই। আবার ঐ পদার্থ ও শক্তিটাও একেরি বিকাশ। তবে তুমি আমি *সর্ব্বদা নানা জিনিষে মন রেখে রেখে আর জগৎটাকে নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নখ কেশাদি সমন্বিত মনুষ্যশরীরের*

ন্যায় একত্র সম্বদ্ধ একটা জীবন্ত জিনিষ বলে ভাব্‌তে পারি না। ওখানে আমাদের "একঘেয়ে" প্রত্যক্ষটাই গোল করে, গণ্ডির বাহিরে যেতে পারে না, আর ভাবে,—ক্রিয়ারহিত জগৎ আবার কোথায়? মানুষের আত্মাতে দ্বন্দ্বপ্রসূত ক্রিয়ারাহিত্য অনুক্ষণ বৰ্ত্তমান। প্রত্যেক পদার্থের শেষ স্তরেও ঐ ব্রহ্মভাব বৰ্ত্তমান। আবার জীবজড়াদির সমষ্টিভূত জগৎটাতেও ঐ। অতএব ঐ একভাবটা কবিকল্পনা বা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নয়। মূলে ঐটাকে ধরেই জগৎটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ভেতরের সদা বৰ্ত্তমান ঐ অবস্থাটা একবার ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌লে আর অনিত্য জন্ম, জরাদি পরিবর্ত্তন এবং তার চরম ফল মৃত্যুও আর আমাদের ভয় দেখাতে পার্‌বে না। সেইজন্য ভগবান্ গীতাকার বার বার অর্জ্জুনকে সাম্‌নে রেখে সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধ্যাদি সৰ্ব্বদা কাজ করুক; কিন্তু তুমি ঐ অকর্ম্ম ভাবটা প্রত্যক্ষ করে সব কাজ থেকে তফাৎ থাক্‌তে শেখ। হে মানুষ! তুমি মান হুঁশ হও, আপনার মহিমায় হুঁশ রাখ, জাগ—অজর অমর আত্মার উপলব্ধি করে অচল অটল শান্তিতে অবস্থান কর। কোনরূপ দুৰ্ব্বলতায় গা ঢেলে দিয়ে অনিত্য জিনিষগুলিকে নিত্য

ধরে রাখ্‌বার চেষ্টা করে দুঃখ পেও না। কর্ম্মফলটা ত্যাগ করে কাজ করে যাও। উহারই নাম যথার্থ সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগও তাই।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

দুই পথই এক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

অর্জ্জুনের মন থেকে কিন্তু কর্ম্মের চেয়ে জ্ঞান বড়, একথা কিছুতেই যাচ্ছে না। তিনি ভাব্‌ছেন জ্ঞান হলে যখন কর্ম্ম থাকে না, তখন জ্ঞানটাই আসল জিনিষ বা লক্ষ্য। অতএব কর্ম্মের চাইতে নিশ্চয় বড়। তিনি ভুলে গেছেন যে, গীতাকার যে জ্ঞানটা মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য বলে তাঁর সামনে খাড়া করছেন, সেটা দেশকালাতীত অসীম অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। অর্জ্জুন যেটাকে জ্ঞান মনে করেন, সেটা নয়। সেটা দেশকালের গণ্ডির ভেতর, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলের ভেতর চির আবদ্ধ। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখ্‌তে পাই, ফের অর্জ্জুনের ঐ প্রশ্ন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ফের ঐ বিষয় বোঝাবার চেষ্টা, এবার কিন্তু ভগবান্ আর একপথ দিয়ে অর্জ্জুনকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ছেন্।

ভগবান্ বল্‌ছেন, হে অর্জ্জুন! ভেবোনা যে, কর্ম্মযোগটা একটা নূতন পথ। জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি পথ

সমূহের ন্যায় ইহাও বহু পূর্ব্বকাল থেকে মানবকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছে এবং জনকাদি বহু খ্যাতনামা রাজর্ষিগণ ঐ পথ আশ্রয় করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয় রাজারা। এই কর্ম্মযোগের কথা আমি প্রথমতঃ সূর্য্যকে উপদেশ দিয়েছিলাম। সূর্য্য তাঁর পুত্র মনুকে বলেন। মনু আবার ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দেন। এইরূপে উহা বহুকাল পর্য্যন্ত 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষকারপ্রধান, তেজস্বী ক্ষত্রিয় রাজ-কুলের ভেতরই জীবন্ত ছিল। সে কর্ম্ম-যোগের আজ লোপ হয়েছে। নিজের সুখটুকু ছেড়ে কেউ আর বহুজনকল্যাণের দিকে তাকিয়ে কর্ম্ম কর্‌তে চায় না। ধর্ম্মের ভেতরেও ব্যবসাদারী পাটোয়ারী বুদ্ধি ঢুকেছে; অন্য কর্ম্মাদির তো কথাই নেই। তাই তোমাকে আজ আবার সেই পুরাতন কর্ম্মযোগের কথা বল্‌ছি। হীনবুদ্ধি, কাপুরুষ, ইন্দ্রিয়দাস, রুগ্নশরীর, ভগ্নোৎসাহ লোকের পক্ষে ঐ পথ অবলম্বনে সিদ্ধি লাভ করা সুকঠিন। কিন্তু তোমার ন্যায় বহুজনকল্যাণে চিরনিবদ্ধদৃষ্টি, শ্রদ্ধাবান, বুদ্ধিমান, তেজস্বী, বীরহৃদয়ই ঐ উদার ভাব বুঝ্‌তে পেরে দৃঢ়ভাবে ধর্‌তে ও অনুষ্ঠান কর্‌তে পারবে। তাই তোমাকে বলা। আপনার শরীরটিতে পাছে কোন আঁচড় লাগে, আপনার ধন,

মান, যশ, প্রভুত্ব প্রভৃতি পাছে না লাভ হয়, এমন কি, আপনার মুক্তিলাভ পাছে না হয়, এইরূপ ভাব যার হৃদয়ে সদা বর্ত্তমান, সে কখন কর্ম্মযোগী হতে পার্‌বে না। কর্ম্মযোগী হবে তেজস্বী, উদারমনা বীর, যে সত্যের জন্য বা অপরের কিছু মাত্র কষ্ট দূর কর্‌বার জন্য, স্বদেশ প্রেমের জন্য, মহাপুরুষের গৌরবের জন্য আপনাকে এককালে ভুলতে পার্‌বে—আপনার সুখ ঐশ্বর্য্যাদির নাশ হলেও ভ্রূক্ষেপ কর্‌বে না।

পুরাতন জিনিষের আদর করা মনুষ্যমনের স্বভাব। পরিবর্ত্তনের স্রোত অতিক্রম করে বহুকাল যা একভাবে থাকে, তারি মানুষের কাছে কদর। অনিত্যের ভেতর নিত্য পদার্থের অনুসন্ধান মানবের প্রাণে প্রাণে সর্ব্বদা আছে বলেই বোধ হয় ঐরূপ হয়। সাধারণ মানবের চেয়ে, গুণী মহাপুরুষদের হৃদয়ে আবার ঐ ভাব বিশেষ প্রবল দেখা যায়। অর্জ্জুনের ন্যায় বীরাগ্রণীর হৃদয়ে ঐভাব প্রবল দেখেই ভগবান্ কর্ম্মযোগের ইতিহাস কীর্ত্তন করে তাঁকে ঐ দিকে নেওয়াচ্ছেন।

আর এক কথা,—ক্ষত্রিয়েরাই, বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয় রাজারাই এই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর্‌তেন, এবং তাঁদের নিকট থেকেই ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণের ভেতর ঐ কর্ম্মযোগের প্রচার হয়েছিল। একথাটায়

নেকের আশ্চর্য্য বোধ হতে পারে, বিশেষতঃ আজ-
লকার ব্রাহ্মণদের তো পারেই। কারণ, তাঁদের
বশ্বাস, ভারতের যত কিছু শাস্ত্রজ্ঞান ব্রাহ্মণবর্ণেরই
একচেটে অধিকারে ছিল, আর তাঁরাই দয়া করে অন্য
র্ণকেও দিয়েছিলেন। এ কথা কোন কোন বিষয়ে
সত্য হলেও সকল বিষয়ে যে নয়, তার ঢের প্রমাণ
আছে। আমরা এই মাত্র দেখ্‌লাম, গীতাকার বলছেন,
কর্ম্মযোগ প্রথম ক্ষত্রিয় রাজাদের ভেতরেই ছিল।
এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পাঠে দেখা যায়, আরুণি
ও শ্বেতকেতু, ব্রাহ্মণ পিতা পুত্রে প্রবাহণ-জৈবলি রাজার
এবং প্রাচীনশালাদি পঞ্চব্রাহ্মণ কৈকেয় অশ্বপতি
রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ
নিচ্ছেন। এইরূপে কর্ম্মযোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম
উদয় যে ক্ষত্রিয়রাজকুলের ভেতর হয়েছিল, একথা শাস্ত্র-
পাঠে খুব সম্ভবপর বলে বোধ হয়।

কর্ম্মযোগের ইতিহাস কীর্ত্তন হতে অর্জ্জুনের মনে
আর এক প্রশ্নের উদয় হল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বল্‌লেন,
সূর্য্যকে তিনি প্রথমে কর্ম্মযোগ উপদেশ করেছিলেন।
অর্জ্জুন ভাব্‌লেন, এ কেমন কথা? শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ত
সেদিন হল, আর সূর্য্যের উৎপত্তি কতকাল পূর্ব্বে
হয়েছে। তাঁকে ইনি উপদেশ দিলেন কি করে?

এই সন্দেহের প্রসঙ্গেই ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার ও তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধীয় কথার অবতারণা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, সূর্য্যকে আমি বহু পূর্ব্বকালে অন্য মূর্ত্তিতে ঐ উপদেশ করেছিলাম। কিন্তু আমিই যে সেই মূর্ত্তিতে ঐ উপদেশ দিয়েছিলাম, এ বিষয় আমার বেশ মনে আছে। কেননা আমি ঈশ্বরাবতার, আমার জ্ঞানের কখন লোপ হয় না। তুমি এবং আমি উভয়ে বহুবার বহুস্থানে জন্মগ্রহণ করে 'বহুজনহিতায়' বহুকষ্টের অনুষ্ঠান করেছি ও কর্‌ব। তোমার সে সব কথা মনে নেই। আমার কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের সকল কথাই মনে আছে। অবতার সম্বন্ধে ভগবান্ গীতাকার কি শিক্ষা দেন, তা আমরা পরবারে আলোচনা কর্‌ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়

(২৯শে পৌষ ১৩১০, বালি হরিসভায়
প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।"

.. ..

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

"যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়,... ...
নেই আমি প্রকৃত ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই।"
নই ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার জন্য আচার্য্যের প্রয়োজন
, তখনই তিনি আচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হন। তিনিই
ার্থ গুরু এবং জগৎও তাঁকেই অনুসরণ করে অগ্রসর
। তিনিই মায়ান্ধ ও বিষয়াসক্ত জীবের
াখ ফুটিয়ে দেন। একভাবে তিনিই সমস্ত জগৎ
:প বিরাজিত, স্থাবর, জঙ্গম, যা কিছু দেখ্‌তে
াই, সকলই তাঁর প্রতিকৃতি; অন্যভাবে তিনিই

সমস্ত জীবজন্তুতে চৈতন্য স্বরূপে বর্ত্তমান আছে
আবার প্রকৃত ধর্ম্ম ও শান্তি স্থাপন কর্‌বার
তিনি জগদ্‌গুরু রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি ম
শরীরে মায়ার অধীশ্বর রূপে অবতীর্ণ হয়ে মায়া
জীবকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করেন। যু
যুগে শরীর বিভিন্ন হলেও অবতার ভিন্ন ভিন্ন ন
একই। তিনিই প্রয়োজনানুসারে নানারূপে অবর্ত
হন। যখন যেরূপ ভাবের দরকার, তখন সেরূপ ভা
অবতীর্ণ হয়ে তিনি লোকশিক্ষা দিয়ে থাকেন
আমাদের এই ভারতবর্ষে তিনি বহুবার অবতীর্ণ হ
বহু ভাব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এই জন্যই ভারত
বর্ষ সকল জ্ঞানের আকর স্বরূপ ছিল। যখনই আবশ্যক
হয়েছে, তখনই তিনি হাত ধরে এই ভারতবর্ষকে
তুলেছেন। সেই জন্যই এখনও পদদলিত, অত্যাচারিত
ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে কত কত ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর
আবির্ভূত হয়ে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।
সেই জন্য আমাদের দেশে এখনও পর্য্যন্ত ধর্ম্মক্ষেত্রে
অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির আদর্শ
দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ধর্ম্মেতেই আমাদের উন্নতি।
আমাদের দেশ ধর্ম্মগতপ্রাণ, ধর্ম্মেতেই যেন বেঁচে
আছে। এখানে নিত্য ক্রিয়া শৌচাদি হতে বিবাহপদ্ধতি

প্রভৃতি গুরুতর সামাজিক নিয়ম সকলও ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপে গণ্য হয়ে থাকে।

সমস্ত আমরা ঠিক ঠিক করতে পারি আর নাই পারি, আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহার, চালচলন সমস্তই যে ধর্ম্মলাভের জন্য, তাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নেই। অবশ্য অন্যান্য দেশ অন্যান্য বিষয়ে খুব বড় হয়েছে। অন্যান্য দেশ রাজনীতি, সমাজনীতি ও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি ঐহিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থানীয় হয়েছে। ভারতের প্রাণ ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, ধর্ম্ম-বলেই ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, আবার ধর্ম্মকে অবলম্বন করেই যে ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি হবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। তারই সূচনা স্বরূপ আজকাল চতুর্দ্দিকে নামে রুচি, সাধন ভজনে শ্রদ্ধা ও ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখতে পাচ্ছি এবং চতুর্দ্দিকেই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের আলোচনা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব্বে জ্ঞান বল্‌লেই লোকে কিম্ভূতকিমাকার ভাব্‌ত, জ্ঞানী বল্‌লেই নাস্তিক ভেবে ঘৃণার চক্ষে চাইত। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বল্‌লে ভক্ত কাণে হাত দিত। আবার জ্ঞানীও ভক্তকে কুসংস্কারাপন্ন বলে উড়িয়ে দিত। এইরূপে বহুকাল ধরে ভক্তি ও জ্ঞান পথের সাধকদিগের ভেতর এইরূপ

বিরোধ চলে আসছে। কিন্তু যাঁরা জ্ঞান ও ভক্তির আচার্য্য ও প্রচারক, তাঁদের মধ্যে এ ভাবের বিরোধ কোনও কালে ছিল না।

একটা গল্প আছে, শিব ও রামের বিরোধ হয়েছিল, তাতে শিবের চেলা ভূত ও রামের চেলা বানরের ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে লাগল। তার পরে শিব ও রামের মিলন হল, উভয়ে একপ্রাণ, এক আত্মা হলেন, কিন্তু বানর ও ভূতের যুদ্ধ আর থামল না। আচার্য্যগণের কোন বিরোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁদের অনুবর্ত্তিগণ চিরকালই বিবাদ করে মরছে। আজকাল বোধ হয়, সে বিরোধের ভাব যেন ক্রমেই কমছে। সে হাওয়া যেন ক্রমেই মন্দীভূত হচ্ছে। যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত ভাবই এক ভগবান হতে প্রসূত। এই চারটি পথ অবলম্বন করেই মানবের ধর্ম্মলাভ হতে পারে, সর্ব্বত্রই যেন লোকের এইভাব, এই ধারণা হতে আরম্ভ হয়েছে।

পূর্ব্বে বলেছি, প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্তে বাস্তবিক বিরোধ নেই। শাস্ত্রপাঠে দেখ্‌তে পাই, পূর্ব্বে যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁদেরই মধ্য হতে নির্ম্মল ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়ে জগৎকে

পবিত্র ও কৃতার্থ করেছে। আবার যাঁরা প্রকৃত ভক্ত বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁরাই জ্ঞানের আলোক বিস্তারে মানবকে সমদৃষ্টির পথে অগ্রসর করেছেন। এই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং যদি থাকে, তবে কোথায় আছে, ইহাই আজকের আলোচ্য বিষয়। শিবাবতার জ্ঞানাচার্য্য গুরু শঙ্কর প্রণীত গ্রন্থ পাঠে আমরা কি দেখ্‌তে পাই? তৎ-প্রণীত গঙ্গা, শিব, অন্নপূর্ণা ও বিষ্ণুর স্তব পাঠ করে কেমন করে বলব যে, তিনি ভক্তিশূন্য কঠোর জ্ঞানী নাস্তিক ছিলেন? শারীরক ভাষ্য ও তৎপ্রণীত অশেষ দেবদেবীর স্তবাদি পাঠ করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, তাঁর মধ্যে ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রয়েছে সেইরূপ ভক্তাবতার আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যেও আবার অদ্বৈত জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যদি তিনি জ্ঞানের বিদ্বেষী হবেন, তবে কেন তিনি পূজ্যপাদ কেশব ভারতীর নিকটে স্বয়ং সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন? উভয় পথের আচার্য্যদের জীবনে ও শিক্ষায় তো কোন বিরোধ দেখ্‌তে পাই না। তবে বিরোধ কোথায়? বিরোধ কথায় ও বাক্যবিন্যাসে। বিরোধ অনুবর্ত্তীদের স্বার্থ পরিচালনে। ভক্তি ও জ্ঞানের চরম লক্ষ্য একই।

একই লক্ষ্যে উপনীত হবার ভিন্ন দুইটি পন্থা মাত্র। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই উদ্দেশ্য কাঁচা "আমিত্বের" বিনাশ করা। যে 'আমি' সংসার ও বিষয় বাসনায় জীবকে বদ্ধ করে রেখেছে, সেই তুচ্ছ মিথ্যা আমিত্বের স্থানে শ্রীভগবানের দাস বা তাঁর অংশ আমি, এই মহান্ আমিত্বের বিকাশ করা। ভক্তি ও জ্ঞান এই কাঁচা আমি বিনাশ করবার দুইটি উপায় মাত্র। ভক্ত চান, তাঁর সমস্ত ভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করতে। সমস্ত কার্য্য ও চিন্তা, অর্থ স্ত্রী বা পুত্র, আপনার বলতে তাঁর যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর নয়, ভগবানের—এই ভাবটি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে প্রাণে রাখা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীর-ধারণোপযোগী আহারাদি ব্যাপারও ভক্ত নিজের জন্য না করে ভগবানের সেবার জন্য করেন। জীবনধারণও তাঁর প্রিয়তমের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কারণে নয়। ভক্ত চান, আমিত্বকে তুমিত্বরূপ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে; আমি অমুকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনী মানী জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমানপ্রসূত আমিত্বকে ঠাকুরের পাদপদ্মে চিরকালের মত ফেলে দিয়ে বিশ্বতোমুখ ভগবানের সেবা করতে। ভক্তের চক্ষে তাঁর প্রিয়তমই জড় চেতন নানারূপে

খেলা করছেন, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি, তিনিই কুমার, কুমারী, তিনিই দাসদাসী, সর্ব্বত্রই তাঁর হস্ত পদ চক্ষু। এ সংসার তাঁরই মূর্ত্তি এই জ্ঞানে যথার্থ ভক্ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি রূপে বিরাজিত তাঁর আরাধ্য প্রভুঁর সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ভক্তের বেঁচে থাকা সেবার জন্য। কিছুতেই আসক্তি নেই। স্বার্থপরতা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে। মরণেও আপত্তি বা কষ্ট নেই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় স্বীয় ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে ভক্ত ইহজীবনেই সাক্ষাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করেছেন। ভক্তির আচার্য্য নারদ ঋষি ভক্তিসূত্রে ভক্তির লক্ষণ করেছেন, 'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা'—'ভগবানে যে ঐকান্তিক প্রেমভাব, তারই নাম ভক্তি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় ঐ রকম ভক্তের কথা বলেছেন, যথা, 'আর্ত্তো জিজ্ঞাসু-রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।' যে রোগে, বিপদে নিতান্ত অভিভূত হয়েছে, নিতান্ত নিরাশ্রয়, সে নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। এরই নাম আর্ত্তভক্তি।

মনে নানাপ্রকার সন্দেহ এসেছে। এই জগতের কেহ কর্ত্তা আছেন কিনা, এই জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হচ্ছে, কে করছে, এর কারণ কি,

এই সকল জানবার জন্য প্রাণ বিশেষ আগ্রহ; বিষয়সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ আর ভাল লাগে না; কোন সৎপুরুষ বা জ্ঞানী পুরুষ দেখ্‌লেই জিজ্ঞাসার জন্য ছুটে তাঁর কাছে যায়; এই সব তত্ত্ব জানবার জন্য ব্যাকুলভাবে নির্জ্জনে চিন্তা করে; এই সব লক্ষণ হলে তাকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলা যায়।

তৃতীয় অর্থার্থী। বিশেষ কোন কামনায় প্রাণ ব্যাকুল আবার তৎকামনা পূরণের নিজের শক্তিও নেই, এজন্য যে ভগবানকে উপাসনা করে, সে অর্থার্থী ভক্ত। চতুর্থ জ্ঞানী। জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। ভগবান বলেছেন, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ"—সর্ব্বদা তাঁর মন ভগবানে যুক্ত হইয়া রয়েছে, সেই একভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। জ্ঞানীর মন সর্ব্বদাই কামকাঞ্চন, বিষয়ানুরাগ, শরীরানুরাগ প্রভৃতির পারে বর্ত্তমান। জ্ঞানীর সম্বন্ধে একভক্তি বিশেষণ এই নিমিত্তই প্রযুক্ত হয়েছে। অবিশ্রান্ত নদীর স্রোতের ন্যায় একভক্তির বিরাম নেই; সর্ব্বদা ভগবৎপাদপদ্মে প্রবাহিত। একভক্তির বিশেষ লক্ষণ দেবীগীতায় সুন্দররূপে প্রদত্ত হয়েছে। পাত্র হতে পাত্রান্তরে তৈল ঢাল্‌লে যেমন অখণ্ডিত ঘনধারে পড়ে

থাকে, সেইরূপ এক প্রকার ভক্তিধারা বিষয়বায়ুতাড়িত হয়ে কখন খণ্ডিত বা তরলায়িত হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ—সমস্তই ভগবানময় এইরূপ যাঁর জ্ঞান হইয়াছে, সেই মহাত্মা জ্ঞানী; এই প্রকার লোক অতি দুর্লভ। এই প্রকার জ্ঞানীর দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র আমিত্ব চিরকালের মত বিদায় গ্রহণ করেছে। তখন তিনি বুঝ্‌তে পারেন, "আমি সকলের অন্তরে বাহিরে, আমি সকলের সাক্ষিস্বরূপ, আমারই শক্তিতে মনবুদ্ধি ক্রিয়াশীল, আমিই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ, আমি সর্ব্ব-ভূতে আছি ও সর্ব্বভূত আমাতে আছে।" এইরূপ জ্ঞান অনেক সাধনা ও চেষ্টার ফলে উপস্থিত হয়। এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে ভগবানে টান হওয়া দরকার; যেমন বিষয়ীর বিষয়ে, সতীর পতিতে, কৃপণের ধনেতে টান, সেই রকম টান হওয়া চাই। যেমন মাতাল মদে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চাই। গীতায় ভগবান্ বলেছেন, "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে"; বিষয়ের ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে যেমন তাতে অত্যাসক্তি এসে জীবকে ধীরে ধীরে বিনাশের পথে নিয়ে যায়,

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ আসক্তির দরকার; ভগবানের ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে ঐরূপ আসক্তি উপস্থিত হলে মানব বিনষ্ট না হয়ে মুক্তির দিকে সত্বর অগ্রসর হয়।

প্রথমতঃ, যাঁরা ভক্ত, ভগবৎপ্রেম যাঁদের জীবনকে পবিত্র করেছে, তাঁদের অপূর্ব্বভাব দেখে সাধারণ মানবের মন আকৃষ্ট হয়ে সেইরূপ হওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়। বিষয়ে যেমন আসক্তি হয়, এও সেই প্রকার আসক্তি। প্রভেদ এই, ইহা উচ্চ বিষয় অবলম্বনে হওয়াতে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। সেই হেতু দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি আচার্য্যেরা বলেছেন যে, কামাদি রিপু তত দিন, যতদিন উহারা রূপ রসাদি বিষয়াবলম্বনে মনে উদিত হয়, কিন্তু একবার উহাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে পার্‌লে উহারাই ভগবান লাভের সহায় হয়। কোন কামনা পূরণ করার জন্য লোকে প্রথমতঃ ভগবান্‌কে ডাকে। কেন না, তাঁতেই সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করবার শক্তি বর্ত্তমান। সকাম মনে ডাকতে ডাকতে মানব যখন একবার তাঁকে ভালবেসে ফেলে, তখন আর তার পালাবার পথ থাকে না। সকাম ভালবাসা হতেই ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম প্রেম এসে উপস্থিত হয়। এই নিষ্কাম প্রেম হলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। শাণ্ডিল্য ঋষি এই

প্রেমের লক্ষণ করেছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে,"—'ঈশ্বরে যে পরম অনুরাগ, তাই প্রেম, তাই পরাভক্তি।' ভক্তরাজ প্রহ্লাদও একস্থলে বলেছেন, "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"—'হে ভগবান, বিষয়ীর বিষয়ে যেমন টান, তোমাতে আমার যেন তদ্রূপ টান হয়।' মনে হয়, যেন প্রহ্লাদ অতি সামান্য কথা বলেছেন। কিন্তু তলিয়ে দেখ্‌লে এর সার্থকতা উপলব্ধি হয়। সাংসারিক ভাব হতে উচ্চ কল্পনা সাধারণ মানবের আসে না। সংসারে পিতা মাতাকে, বন্ধুকে ও স্বামী প্রভৃতিকে যেমন ভালবাসা যায়, তেমন ভালবাসা বা মনের টান ভগবানে হলে ভগবান্ লাভ অতি সন্নিকট হয়।

বৈষ্ণবগণ এই জন্য ভক্তির পাঁচ ভাগ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, প্রত্যেক লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে এক একটি পার্থিব সম্বন্ধ অতি মধুর বলে উপলব্ধ হয়। মহাভারতে দেখ্‌তে পাই, ভীষ্ম, উদ্ধব, বিদুর, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নানালোকে এক শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব স্ব প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসছেন। কিন্তু সকলে তাঁর সহিত একই সম্বন্ধ স্থাপন কর্‌তে পার্‌ছেন না। বিদুরের দাস্যভাব, অর্জ্জুনের

সখ্যভাব। ভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে এক একজন আবার এক এক কর্ম্মে নিযুক্ত। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট গীতা শ্রবণ করে ও তাঁর পাদুকা নিয়ে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করতে চল্লেন। বিদুর নানা রূপে সেবা ও নানা তীর্থ পর্য্যটন করে পরে পরমহংস-পদবীলব্ধ অদ্বৈত জ্ঞানে শরীর ত্যাগ কর্‌লেন, অর্জ্জুন আবার সেই গীতোক্ত জ্ঞান লাভ করে অলৌকিক উদ্যমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। গোপীদের আবার অন্য ভাব। শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে তাঁরা গৃহকর্ম্ম, স্বামী, পুত্র, কন্যা, এমন কি, তাঁদের দেহ পর্য্যন্ত ভুলে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। একজন গোপিকা তাঁর স্বামী কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হয়েছিলেন। ফল এই হল যে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে করতে তন্ময় হয়ে সমাধিতে শরীর পরিত্যাগ করলেন। একথা ভাগবতে লিপিবদ্ধ। আবার রাসলীলার কথা মনে হলে এই তন্ময়ত্বের ভাব আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হন, তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে এমন তন্ময় হন যে, আপনাদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে "আমিই শ্রীকৃষ্ণ" এই ভাবে ভগবানের

লীলানুকরণ করেছিলেন। ভক্তির চরমে এমন তন্ময় হয় যে, উপাস্য উপাসক এক হয়ে যায়। শ্রীমতী রাধাকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "তুমি শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখ?" তাতে তিনি উত্তর করেন, "নাসৌ রমণো নাহং রমণী"—আমি একেবারে ভুলেছি যে, আমি রমণী ও তিনি পুরুষ এবং আমার স্বামী এবং এই জন্য আমি তাঁকে ভাল-বাসি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার প্রেম সাধারণ স্ত্রীর প্রেমের ন্যায় শরীরানুরাগ বা গুণানুরাগ অবলম্বনে প্রবাহিত নয়। কিন্তু হেতুশূন্য হয়ে স্বতঃই সর্ব্বদা প্রবাহিত থাকে। আমরা দেখ্‌লাম যে, ভক্তির চরমে দেহাত্মবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র আমিত্ব একেবারে চলে যায়। এখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ইহা কতদূর সত্য, দেখা যাক। জ্ঞানী বলেন, এই আমি ঠিক নয়, মায়া; তবে কোন্‌টি প্রকৃত আমি? প্রকৃত আমি শরীর, মন প্রভৃতি সকলের অতীত ও এদের সাক্ষি-স্বরূপ; সকল অবস্থায়ই একরূপে বর্ত্তমান, হ্রাস বৃদ্ধি নেই। এই আমি সকলেতে। আমাদের এই ক্ষুদ্র আমি সেই মহান্ আমিত্বের অংশ মাত্র। সেই মহান্ আমিত্ব হতে এই ক্ষুদ্র আমিত্বের উদ্ভব। জ্ঞানীর উদ্দেশ্য, এই মহান্ আমিত্বের সর্ব্বদা উপলব্ধি করা,

এই ক্ষুদ্র আমিকে সেই মহান্ আমিত্বে ডুবিয়ে দেওয়া।

অতএব দেখা গেল, ভক্তের তন্ময়ত্ব ও জ্ঞানীর মহান্ আমিত্ব একই। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই ক্ষুদ্র আমিত্বকে ডুবাতে চাইছেন। হনুমান্‌কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি কি ভাবে রামচন্দ্রকে উপাসনা কর?" তাতে তিনি উত্তর করেন, "যখন আমার মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে নিবদ্ধ থাকে, তখন দেখি, তিনি প্রভু ও আমি তাঁর দাস। যখন আপনাকে জীবাত্মা বলে অনুভব করি, তখন দেখি, তিনি পূর্ণ ও আমি তাঁহার অংশ। তিনি সূর্য্যস্বরূপ এবং আমি সেই সূর্য্যের বহু কিরণের একটি মাত্র। আবার যখন আমার মন সমাধি অবলম্বনে সকল উপাধির বাইরে যায়, তখন দেখি, তিনি ও আমি এক।" অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, স্থূল শরীরে ও স্বার্থপরতার মধ্যে মন থাক্‌লে সোঽহং বলা নিরর্থক! জীবাত্মা বলে আপনাকে উপলব্ধি কর্‌লে মানব আপনাকে ভগবানের অংশ মাত্র বলে বোধ কর্‌বে। আর যখন সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে মানব আপনার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি কর্‌বে, তখনই তার উপাস্যের সহিত অভিন্ন ভাব আসবে।

মনের অবস্থাভেদে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এসে উপস্থিত হয়। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর উপযোগী এই তিন প্রকার মতই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখ্‌তে পাই। আমরা দেখ্‌লাম, ভক্ত চায় সব ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করে ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ করতে। আর জ্ঞানীও বলেন, "মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে।" আমিত্বই জঞ্জাল। অতএব উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কেবল কথার প্রভেদ, লোকে বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু ঠিক ভক্ত ও ঠিক জ্ঞানী কথায় ভোলে না। তারা চায় যথার্থ সত্য অনুভব করতে। উত্তর-গীতায় আছে, "মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রানি চৈব হি। সারং তু যোগিনঃ পীতাস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥"—সার বস্তু অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবানকে ছেড়ে পণ্ডিতগণ কেবল মাত্র বাগাড়ম্বররূপ ঘোল খেয়ে থাকেন। জ্ঞানী পুরুষই দুগ্ধের সার বস্তু মাখনের ন্যায় শাস্ত্রের সার গ্রহণ করে থাকেন। উত্তর গীতায় এ সম্বন্ধে আর এক শ্লোক আছে—

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।"

'চন্দন কাষ্ঠের ভারবাহী গর্দ্দভ ভার বয়েই মরে,

চন্দনের গন্ধ অনুভব কর্‌তে পারে না।' পণ্ডিতাভিমানীর এই দশা।

কার্য্যে না পরিণত কর্‌লে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনা আর না শোনা উভয়ই সমান। সত্য অনুভব কর্‌তে হবে, জ্ঞান ও ভক্তি জীবনে পরিণত করতে হবে। উন্নত হতে হলে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ তিনটিরই প্রয়োজন। দুটি পাখা ও একটি পুচ্ছ না হলে পাখী উড়্‌তে পারে না। এই রূপ জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এ তিনটি না থাক্‌লে যথার্থ উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। জ্ঞানবিচার-বিরহিত ভক্তের মন কীর্ত্তনের সময় যেমন উচ্চে উঠে থাকে, কীর্ত্তনান্তে তেমনি আবার বিষয়ের প্রলোভনে পড়ে যায়। বিচারবিবেকবিরহিত মনকে তখন ধরে রাখা অসম্ভব। জ্ঞান-বিচার ও যোগ সে সময়ে সমতা রক্ষার সহায়ক। মনকে আয়ত্ত কর্‌তে হবে। সে শক্তিও আমাদের ভেতরেই আছে।

মন মুখ এক করাই এই বিষয়ের প্রধান সাধন। পরমহংসদেব বল্‌তেন, মন মুখ এক করার নামই প্রকৃত সাধন। যদি কেহ মন মুখ এক করে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে, তিনি কি তাহা পূর্ণ কর্‌বেন না? ধ্রুবের গল্প স্মরণ কর। সে মন মুখ এক করে বনে ভগবান্‌কে ডাক্‌ছিল। কোন সহায় ছিল না, এমন

কি, গুরুর সহায়তা পর্য্যন্ত ছিল না। মন মুখ এক করেছিল বলেই ভগবান গুরু দিলেন ও তাকে দর্শন দিলেন। মন মুখ এক হলে যা কিছু দরকার, তিনি জুটিয়ে এনে দেবেন। গীতাতেও আমাদিগকে বল্‌ছেন, "মন মুখ এক কর।" যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের মনে মোহ ও ভয় এসেছিল। মোহ—আত্মীয় স্বজনের জন্য, যাঁরা যুদ্ধার্থী হয়ে কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। ভয়—ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, সমকক্ষ কর্ণ, শাস্ত্রাচার্য্য দ্রোণ, শিবপ্রদবরদর্পী জয়দ্রথকে বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে। ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সোজা নয়। মায়ার অপূর্ব্ব প্রভাব। অর্জ্জুনের ন্যায় মহাপুরুষেরও সাময়িক মোহ ও ভয় এসেছিল। এইরূপ মোহ ও ভয় মানবের স্বাভাবিক। তিনি তাঁর কর্ত্তব্য ভুলে গিয়েছিলেন। ভেতরে শোক, ভয় ও মোহের নিমিত্ত যুদ্ধ ত্যাগের সংকল্প ও মুখে ধর্ম্মের ভানে যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন কর্‌বার কথা বলেছিলেন। ভগবান অন্তর্য্যামী, তিনি বলেছেন ;—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

'তুমি পণ্ডিতদের মত, ব্রহ্মজ্ঞানীর মত কথা বলছ, আবার আত্মীয় স্বজনের জন্য শোক করছ।' যথার্থ জ্ঞানী নিজের বা অপরের শরীর নাশেও শোক

করেন না। তোমার কথায় ও কাজে মিল নেই। পরমহংসদেবও আমাদের ঐ কথা বল্‌তেন, "মন মুখ এক কর।" মন মুখ এক হলে উন্নতি কে রোধ করে? এক সাধন প্রভাবে যা কিছু দরকার, আপনি এসে উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্লোকটি এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটি মনে রেখে জীবনে পরিণত করতে পার্‌লেই ধর্ম্মলাভের বাকী থাকে না।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

'মন মুখ এক করে আমার শরণ গ্রহণ কর।' আর একটি কথা আমরা সকলেই ভুলে গেছি—সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞান। পরমহংসদেব বল্‌তেন,—"সংসারে ধনী লোকের বাড়ীর চাক্‌রাণীর মত থাক্‌বি।" চাক্‌রাণী নিজের সন্তানের মত প্রভুর ছেলেদের মানুষ করে, কিন্তু জানে যে, যখন তাকে বিদায় দেবে, তখনই যেতে হবে। এই প্রকারে সংসারে থাক। স্ত্রী পুত্র তিনিই ন্যস্ত স্বরূপ তোমার কাছে রেখেছেন। ন্যস্ত স্বরূপই বা কেন, তিনিই স্ত্রী পুত্র নানা মূর্ত্তিতে তোমার সেবা গ্রহণ করছেন। যা কিছু করছ, তাঁরই সেবা করছ। কাঙ্গালীকে খাওয়াচ্ছ, কি ভিক্ষুককে একটি পয়সা দিচ্ছ, তিনিই ভিক্ষুক ও

কাঙ্গালী রূপে তোমার সেবা নিচ্ছেন। এই ভাব মনে রেখে কাজ করো। অহঙ্কার ত্যাগ কর। অহঙ্কারেই সর্ব্বনাশ। এই ভাব পেলে আর ভয় নেই, কিছুতেই আর বাঁধ্‌তে পার্‌বে না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা, যেন এই ভাবটি সর্ব্বতোভাবে আমাদের সকলের মনে আজ হতে উদিত থাকে।

ওঁ হরিঃ ওঁ। শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

সপ্তম অধ্যায়

বেদান্ত ও ভক্তি

বাঙ্গালাদেশে জ্ঞান ও ভক্তির ধারণা কিরূপ

এদেশে ভক্তির প্রাধান্য। কোমলাঙ্গ, কোমলস্বভাব বাঙ্গালী—ভক্তির ধর্ম্মই বোঝে ;—ভক্তিশাস্ত্রের শব্দাবলী (যথা—দর্শন, ভাব, প্রেম, সাত্ত্বিকবিকার, ইত্যাদি) প্রয়োগে সুচতুর। বাঙ্গালার কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তির ভালবাসার কথাই গেয়েছেন। আধুনিক কবিরাও "মহাজনো যেন গতঃ" বলে প্রধানতঃ সেই পথেই নৌকো চালিয়েছেন। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ বঙ্গদেশ ধন্য করেছিলেন, —অপূর্ব্ব প্রেম ও অলৌকিক ত্যাগের মিলনভূমি যাঁর জীবন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার পবিত্রতা বুঝ্‌বার প্রধান সহায়,—তিনিও ভেতরে যাই থাক, বাইরে ভক্তির কথাই জনসমাজে প্রচার করেছিলেন এবং ভক্তির প্রভাবেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। বাঙ্গালীর দেশ, শরীর, স্বভাব, ভাষা

কবিতা ও পূর্ব্বেতিহাস, ভক্তির বিশেষ উপযোগী না হলে কখনই আমাদের ভেতর ভক্তাবতার—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর আবির্ভাব হত না।

বাঙ্গলায় ভক্তি-ধর্ম্ম যেমন প্রবল, জ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চ্চাও আবার তেমনি বিরল। "ইনি বড় জ্ঞানী ও বিচারবান্" একথা বল্‌লে, দেশের অধিকাংশ লোকে ভাবে—সে আবার কি?—ইনি ত কীর্ত্তনে নাচেন না?—কৈ ভগবৎ-প্রেমে ত এঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি উপস্থিত হয় না। আবার যদি কেহ জ্ঞানশাস্ত্র-পরিচিত সমাধি, অস্তি-ভাতি-প্রিয়, পঞ্চকোষ, সপ্তভূমিকা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেন তা হলেই চক্ষুস্থির!—-অধিকাংশ শ্রোতা এদিক ওদিক দেখে পাশ কাটাতে ব্যস্ত হন। কেহ বা বলেন 'শুষ্ক মার্গ'। কেহ বা—গোঁড়ামির স্রোতে গা ঢেলে, আর একটু অগ্রসর হয়ে—'বেদান্ত', 'অদ্বৈতবাদ', 'নাস্তিকতা' 'ঈশ্বরাবমাননা', 'নরকে যাবার পথ'—সব একই কথা স্থির সিদ্ধান্ত করে, নাসিকা উত্তোলন ও ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

বাস্তবিক কি তবে, ভক্তি ও জ্ঞান-পথের সামঞ্জস্য নেই? জ্ঞান ও ভক্তির মিলনভূমি কি কেহই স্পর্শ করতে পারেন না?

ধর্মশাস্ত্রাদিতে জ্ঞান ও ভক্তির অদ্ভুত সামঞ্জস্য

শাস্ত্র পাঠে অবগত হই, ভক্তি শাস্ত্রের ভেতরেই কত জ্ঞানের কথা! ভক্তি-প্রধান শাস্ত্র বিষ্ণু-ভাগবতে, পদে পদে জ্ঞান ও অদ্বৈতবাদের অবতারণা। নারদাদি ভগবদ্‌ভক্তেরা ব্রহ্মজ্ঞানের নিন্দা করা দূরে থাকুক, তার জন্য কত যত্ন, কত তপস্যাই করছেন। পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থানের জন্য, স্বয়ং প্রয়াসী; ভক্তাগ্রণী উদ্ধবকে তিনি একান্ত, তুষারধবলিত, সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের উদ্বাহভূমি বদরিকাশ্রমে, জ্ঞান সাধনার্থ পাঠাচ্ছেন; ভক্তি ও প্রেমের মূর্ত্তিরূপিণী ব্রজাঙ্গনাদের ধ্যান ও জ্ঞান বৃদ্ধি করবার জন্য, 'কোকিলকূজিত কুঞ্জ'-মধ্য হতে অন্তর্দ্ধান হচ্ছেন। আবার, অনন্যচিত্ত তন্মনস্ক গোপিকাগণ, কিশোর ভগবানের কমনীয় মূর্ত্তি ধ্যান করতে করতে, 'আমি বাসুদেব' ইত্যাকার একতা জ্ঞানের আভাস অনুভব করছেন। এমন কি, প্রেমের উজ্জ্বলভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও স্বয়ং কেশব ভারতীর নিকট হতে, "তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ও পূর্ণ স্বরূপ" এই মহামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করছেন।

অন্যদিকে আবার কুমার-সন্ন্যাসী, ত্যাগ ও জ্ঞানের জ্বলন্তমূর্ত্তি, ভগবান শঙ্করাচার্য্য—বৌদ্ধ বিপ্লবের পর

যিনি সমগ্র ভারতে বেদ-ধর্ম্মের সনাতন ধ্বজা পুনরুত্তোলন করেন—শিবাবতার সেই মহাবীরের, ভক্তিসুধাপ্লুত হরি হর গিরিজা ও গঙ্গা-স্তোত্রাদি পাঠে কে না বিমোহিত হয়ে থাকেন? মায়াগন্ধহীন পরমহংসাগ্রণী, মহাতেজা ভগবান্ শুক স্বয়ং—ভাগবতবক্তা। সনক সনাতনাদি আত্মারাম মুনিগণ ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করছেন। বেদমূর্ত্তি মহাজ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করে শান্তি-লাভ করছেন। এমন কি 'জ্ঞানসিন্ধু' 'জগৎ-গুরু' মহাদেব—যিনি স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বের প্রধানাচার্য্য—হরিভক্তি প্রদান করে মহামুনি নারদের জীবন চিরকালের জন্য ধন্য করছেন।

অতএব আমাদের পূর্ব্ব প্রশ্নের সামঞ্জস্য নিশ্চিত আছে।—স্থির মনে শ্রদ্ধার সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের পদ-প্রান্তে জিজ্ঞাসু হয়ে বসলেই বুঝতে পারব।

জ্যোতির্ম্ময় আত্মাপক্ষী অনন্ত চিদাকাশে উড়বার প্রয়াস পাচ্ছে। জ্ঞান ও ভক্তি তার বিস্তারিত পক্ষদ্বয়; এবং যোগ—গতি-নিয়ামক পুচ্ছ। তিনটি অঙ্গ সবল ও সমানভাবে পরিবর্দ্ধিত না হলে, উড়বার চেষ্টা বৃথা। পক্ষদ্বয় না থাকলে গতি-শক্তিই সম্ভবে না। আবার সংযমপুচ্ছ না থাকলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে শক্তি অন্যদিকে ব্যয়িত হয়, অভীষ্ট ফল

প্রদান করে না; বেদমূর্ত্তি তপোধন ব্যাস এই মহা সত্যের উপদেশ করেছেন। যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, যে কোন ধর্ম্মে যত ধর্ম্মবীর, অবতার আচার্য্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে ধরা ধন্য করেছেন; কামকাঞ্চন-স্বার্থপরতার উন্মত্ততা ও কোলাহলের মধ্যে যাঁদের অলৌকিক জীবন 'সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং' ধর্ম্মালোক বিস্তার করে, হতাশ মানবের নয়ন মন স্তম্ভিত ও প্রবুদ্ধ করেছে; বসন্তাগমে বৃক্ষ লতিকার ন্যায়, যাঁদের আগমনে, মৃত মনে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে মরুভূমির ধূসরতা হরিৎ-পুঞ্জে পরিণত করেছে;—তাঁদের জীবনবেদ পাঠ করে জ্ঞান ও ভক্তির কি বিচিত্র সম্মিলন দেখতে পাওয়া যায়! জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব পরিণয়, তাঁদের জীবনে যে কি মহান্ উদারতা প্রসব করেছিল, তা জগতের ধর্ম্মেতিহাস-পর্য্যালোচনায় সম্যক্ বুঝতে পারা যায়। এই উদারতার বলেই শ্রীচৈতন্য যবন-হরিদাসকে শিষ্য করতে এবং আচণ্ডালে প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এই উদারতার বলেই ভগবান ঈশা সামারিটান্-কন্যার জলপান, বেশ্যা-মেরীর সেবা-গ্রহণ এবং য়াহুদী ও অন্য জাতিকে সমান ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন; ইহার প্রভাবে

ভগবান শাক্যসিংহ জ্ঞানের সুদৃঢ়স্তম্ভস্বরূপ হয়েও বিম্বিসারযজ্ঞে একটি ক্ষুদ্র, নগণ্য ছাগশিশুর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করতে প্রসন্ন চিত্তে উদ্যত হয়েছিলেন। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব সম্মিলন, তেজ ও মাধুর্য্যের বিচিত্র সমাবেশ, ভারতের পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, "মানুষ কেউই আমায় এককালে ছেড়ে অবস্থিত নয়; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে আমার দিকে আসছে; যে দিক্ দিয়েই যাক্ না কেন, আমি তাকে সেই দিক্ দিয়েই ধরি।"

হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমান ভাবে বর্দ্ধিত, এমন লোক জগতে অতীব বিরল। একটি অপরটির ব্যয়ে বর্দ্ধিত হচ্ছে, একটি বেড়ে অপরটিকে আওতায় ঘিরেছে, —ইহাই সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমভাবে পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে সমভাবে কার্য্য করছে—হৃদয় একদিকে ভাবের সাগর হয়ে সমস্ত জগতকে আপনার করে নিয়ে অত্যল্পমাত্র ভাবস্পন্দে নেচে উঠছে এবং মস্তিষ্ক অপরদিকে—কূট জটিল প্রশ্ন সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করে ভেতরের সারবস্তু গ্রহণে সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে—ইহাই আদর্শ এবং দেব ও গুরুর বিশেষ

প্রসাদ ভিন্ন পাওয়া অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির আবহমানকাল ধরে যে বিবাদ তার প্রধান কারণ ঠিক এইখানে পাওয়া যায়। গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা, হীনবুদ্ধি, একদেশীভাব, এ সকলই হৃদয় মস্তিষ্কের অযথা সংস্থাপনের ফল; এবং ধৈর্য্য, বীর্য্য, শ্রদ্ধা, উদারতা, এমনকি জীবন্মুক্তিও ইহা-দেরই যথাযথ সংস্থানের ফল। মুক্ত হওয়া আর কিছুই নয়, নীতি, চরিত্র প্রভৃতি তখন আর প্রয়াস করে রক্ষা করতে হয় না—নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চা-লনাদির ন্যায় স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে আসে। তখনই মানুষের আপন মন গুরু হয়ে দাঁড়ায়, যাহা ভাল বলে গ্রহণ করে তাহা নিঃসংশয় ভাল হয় এবং যাহা মন্দ বলে তাহা তেমনি নিশ্চিত মন্দ হয়। তখন "মা আর তার পা বে-তালে পড়তে দেন না।"

জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ কোথায়

তবে জ্ঞান ভক্তির বিরোধ কোথায়?—পথে ও কথায়। কথার বিবাদ মিটে গেলে বোধ হয় জগতের চার ভাগের তিন ভাগ ঝগড়া মিটে যায়। এক শব্দে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লক্ষ্য করে, বা এক শব্দে

একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষ্য করে আমাদের মধ্যে যত বিবাদ উপস্থিত হয়। আমেরিকার সুবিখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত জন্‌ভিস্ক্‌ বলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের ভাব ও দৃষ্টি নিয়ে দেখবার শক্তিহীনতাই যত বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ। হারবার্ট স্পেন্সর আর একটু অগ্রসর হয়ে এই রোগের কারণ ও ঔষধ নির্দ্দেশ করেছেন—"জয়ের আদর কমে আমাদিগের হৃদয়ে যত সত্যের আদর বাড়বে, আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ এত দৃঢ়তার সহিত কেন স্বমত পোষণ করে তার কারণ-অন্বেষণের চেষ্টাও আমাদিগের ভেতর তত বলবতী হবে; এবং 'লক্ষ্য-বিষয়ে তারা এমন কিছু দেখেছে যা' আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না' এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের, তারা যতটুকু সত্য পেয়েছে, তার সহিত আমরা যতটুকু পেয়েছি, তার, সংযোগের চেষ্টা হবে।" পরমহংসদেব এ বিষয়ে তাঁর সেই সুমিষ্ট গ্রাম্য ভাষায় বলতেন, "ওরে কোনও জিনিষের 'ইতি' করিস্‌নি,—ভগবান ত দূরের কথা। 'ইতি' করা, 'এটা এই—এছাড়া আর কিছু হতেই পারে না' মনে করা—হীন বুদ্ধির কাজ।"

অনন্ত ঈশ্বরে 'ইতি'—অসম্ভব

অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের খেলা—এই ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম এর এক একটি অংশও অনন্তত্বের পরিচয় দেয়। এক গাছি তৃণ, একটি বালুকণা, বা বিশেষ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-গ্রাহ্য একটি প্রাণি-বীজের শরীরগঠন ও গুণ ইত্যাদির ইয়ত্তা কে করতে পারে? সেইজন্যই বেদ বলেছেন, "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" পূর্ণ তিনি, পূর্ণ তাঁর জগৎ; সেই পূর্ণানন্ত-স্বরূপ হতেই এই অসীম জগৎ প্রসূত, কিন্তু তাতে তাঁর হানি বা হ্রাস হয় নি। কারণ অনন্ত-পদার্থ হতে অনন্ত পদার্থ নির্গত হোক না কেন—যে অনন্ত সেই অনন্তই থাকে।

বাস্তবিক মানব নিজেও অনন্ত এবং অনন্তের সহিতই চিরকাল খেলছে। 'করতলামলকবৎ' অনন্তকেই সে ধরছে ছুঁইছে, দেখছে, শুনছে। কেবল তার ভেতর কি একটু কোথায় গোলমাল হয়েছে যার জন্য সে তাতে সান্ত বুদ্ধি করছে। পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, জড় চেতন উচ্চ নীচ, ক্ষুদ্র মহান্, সকল স্থানে একবার সেই অনন্ত

বুদ্ধি আন দেখি,—ধরা স্বর্গ হবে; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু কোথায় লুকাবে; ধর্ম্ম, ভক্তি, মুক্তি—আর কাল্পনিক ধোঁয়া ধোঁয়া শব্দ মাত্র থাকবে না; আর সর্ব্বত্র, সকলের মধ্যে দেখবে—সেই জীবন্ত বিশ্বরূপী বিরাট, সেই 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং', সেই ভীষণ হতেও ভীষণ এবং শোভন হতেও শোভন, নিবিড় আঁধার ও অনন্ত জ্যোতি-হিল্লোলের বিচিত্র সমাবেশ, করালবদনা শবশিবা! এই দেবতুল্লভ পূর্ণ-দর্শনের প্রথম সোপানই হচ্ছে—'ইতি না করা'।

'আমি' ও 'তুমি'

'আমি', ও 'তুমি'—এ চুটি অতি সহজ কথা। জন্মাবধি মানুষ বোধ হয় এ চুটির যতবার উচ্চারণ করে ততবার আর কোনটির করে না। এ চুটি পৃথক্ ভাব, জীবনে প্রথমেই শিক্ষা হয়; আবার এই চুই বস্তু এতই বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, এ চুটিতে গোল হবার আদৌ সম্ভাবনা নেই। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ বোধ হয় ঐ চুটি শব্দ হতে যত হয়েছে, এত আর কিছুতে হয় নি।

'তুমি' ও ভক্তি

ভক্ত বলেন—"ঠাকুর! আমি কিছু নই, তুমিই সব।

রোগে শোকে জর্জ্জরীভূত, কাম ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়, যশ মানের কাঙ্গালী, বায়ুর ন্যায় অস্থিরমতি,—এ 'আমির' আবার শক্তি আছে? এ 'আমির' দ্বারা আবার সাধন হবে, ভজন হবে,—তোমায় পাব? জলে শিলা ভাসা, বানরের সঙ্গীত, আকাশ-কুসুমও কোন কালে সত্য হতে পারে; কিন্তু এই নগণ্য 'আমার' শক্তি আছে এবং সেই শক্তিতে তোমায় ধরব—ইহা কখনও সম্ভবে না। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বস্ব ধন; তোমার যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক। নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু তুঁহু তুঁহু।" ভক্ত দেখেন এক মহান্ 'তুমি'—যার নিয়মে সূর্য্য তারকা ফিরছে, অগ্নি—জ্যোতি দিচ্ছে, মৃত্যু—সমুদায় গ্রাস করছে। ভক্ত দেখেন, সেই 'তুমি' আবার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, বাহুর শক্তি; প্রেমই তাঁর স্বরূপ, তিনি পরম সুন্দর!! সে সৌন্দর্য্যের কাছে আর সকল সৌন্দর্য্য অন্ধকারে পরিণত, সে বীর্য্যের কাছে অন্য সকলের বীর্য্য পরাহত। এই মহান্ তুমি—নিকট হতেও নিকটে, আপনার হতেও আপনার। মোহিত ও স্তম্ভিত হয়ে, ভক্ত এঁকেই ইষ্ট-দেব বলে বরণ করেন এবং 'তুমি'-নাম-মহামন্ত্রে মহোৎসাহে দীক্ষিত হন।

'আমি' ও জ্ঞানী

জ্ঞানী দেখেন, শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; মনও তদ্রূপ,—ফিরছে, ঘুরছে, বাড়ছে, কমছে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র-বারির ন্যায়, ভাবরাশি কখন উত্তাল তরঙ্গ তুলে গভীর গর্জ্জনে ছুটছে, আবার কখনও বা অস্তমিত শক্তি,—ফল্গুর ন্যায় ক্ষুদ্র ধারা,—বালুকা ভেদ করতে না করতে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যের ভেতর —জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির ভেতর,—শরীর, মন, বুদ্ধির ভেতর,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের ভেতর,—এক অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় নির্ম্মল নিত্যস্রোত বইছে, যার আঘাত অন্তরে লাগায় অবিরত 'অহং', 'অহং' ধ্বনি উঠছে; বুদ্ধি—দোলায়মান চিত্তবৃত্তিকে বিশেষ বিশেষ রূপসম্পন্ন করে নিশ্চয়াকৃতি করছে; প্রাণচক্র পরিবর্ত্তিত হয়ে, ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রেখেছে। জ্ঞানী, এই অনিত্যের ভেতরে সেই নিত্যের, অচেতনের ভেতর সেই সচেতনের অশক্তিকের ভেতর সেই পরিপূর্ণশক্তিকের দর্শন পেয়ে, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হলেন। আবার দেখলেন, সেই নিত্যের ছবি, স্ত্রী পুরুষ, জীব জন্তু, গ্রহ নক্ষত্র,

জড়, চেতন, সমুদায় জগতে বর্ত্তমান। দেখলেন, এই ক্ষুদ্র 'আমির' যথার্থ স্বরূপ—মহান্ ও নিত্য। মহোল্লাসে বলে উঠলেন, "আমাতেই এই জগৎ উঠছে, ভাসছে, লীন হচ্ছে। আমিই জ্ঞান ও শক্তির একমাত্র আকর। আমিই নারায়ণ। আমিই পুরান্তক মহেশ। মৃত্যু ও শঙ্কা কি আমায় স্পর্শ করতে পারে? জন্ম জরা বন্ধনই বা আমার কোথায়?"—

"ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষ্য একই

তবে ভক্তের 'মহান্ তুমি' ও জ্ঞানীর 'মহান্ আমির' মধ্যে আর প্রভেদ কোথায়?—কেবল মাত্র বাক্যে। দুজনেই এক বস্তুকে লক্ষ্য করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেন মাত্র। উভয়েই বলেন, ইন্দ্রিয় সকল সংযত কর, নিত্য পদার্থে বিশ্বাস কর, এবং এই 'ক্ষুদ্র আমি', 'কাঁচা আমি', ছেড়ে দাও—উহাই যত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। কাঁচা আমিকে, ভক্তি বা বিবেক-বৈরাগ্যের জ্বলন্ত আগুনে,

পোড় খাইয়ে, মহান্ আমি বা তুমির সহিত সম্বন্ধ পাতিয়ে, 'পাকা' করে লও। আবার,—জোর করে সম্বন্ধ পাতাতেও হবে না;—পরস্পর আকর্ষণ ও সখ্য উভয়ের নিত্যকাল বর্ত্তমান দেখতে পাবে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩

জীবাত্মা ও পরমাত্মা—দুটি পক্ষী

উর্দ্ধমূল অবাক্‌শাখ এই সংসার অশ্বত্থের দুই শাখায় দুটি পক্ষী বসে রয়েছে। দুটিই সুন্দর এবং চিরপ্রেমে পরস্পর আবদ্ধ। তাদের একটি সুখদুঃখময় ফলভোগে ব্যস্ত, 'আমি আমার' জ্ঞানে নিরন্তর মোহিত ও ব্যথিত; অপরটি আপনার মহিমায় দীপ্তিমান, ভোগে আদৌ দৃষ্টি নেই। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যখনই প্রথমটি ফলভোগের

বাঞ্ছা ছেড়ে দেয় অমনি অপরটির হিরণ্ময় রূপ এবং কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহিমা তার নিকট প্রকাশিত হয়। আর তাকে সুখদুঃখ, পুণ্যপাপ স্পর্শ করতে পারে না। কামকাঞ্চনের আবরণে তার অঞ্জনরহিত চক্ষু আর কখনও আবৃত হয় না। অনিত্যের মধ্যে সেই একমাত্র নিত্যপদার্থের, বহুর মধ্যে সেই একের উপলব্ধি করে সে আপনাকে ও সকলকে সেই এক বলেই ধারণা করে এবং পরম সমতা ও শক্তিলাভ করে।

অজ্ঞানাবরণের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ

বাস্তবিক মনুষ্য কখনও ভগবান হতে দূরে অবস্থিত নয়। নীচ সঙ্গে, নীচকর্ম্মে সে যতই নীচগামী হোক না কেন, তার দৃষ্টি সেই হিরণ্ময় পুরুষের 'সূর্য্যকোটি-প্রতীকাশ' রূপ হতে কখনই একেবারে বঞ্চিত নয়। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির হলেই সে দেখতে পায়, রোগ শোকে অভিভূত হলেই তাঁকে কিছু না কিছু উপলব্ধি করে। নতুবা শিক্ষাবিহীন, হিংসাজীবন ঘোর স্বার্থপর বন্যের ভেতর কোথা হতে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হয়? অন্ধতমসাবৃত তার জীবনে কোথা হতে শ্রদ্ধার আলোক উপস্থিত হয়ে

ধীরে ধীরে স্বার্থপরতার রজনী অপসৃত করে? ধূমকেতু হতেও অনিয়তগতি তার চরিত্রে কোথা হতে সমাজবন্ধন, বিবাহবন্ধন, স্বজনস্নেহ, দেশহিতৈষিতা ইত্যাদি উপস্থিত হয়ে পরিশেষে জগতের মঙ্গল কামনায় তাকে নিযুক্ত করে? কেনই বা সে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের, শৃঙ্গবিদারী বজ্রের, বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থের বা পরলোকগত আত্মার সম্মুখে অবনতজানু, অবনতমস্তক হয়? বলবে অজ্ঞতা, বলবে কুসংস্কার, বলবে কুহকিনী কল্পনার মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ভৌতিক জড়পদার্থ ও শক্তিতে চেতনের ইচ্ছাময়ী লীলার তরঙ্গভঙ্গ আরোপিত করে, বলবে ভয়ে বা ভালবাসায় অথবা অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যে—যেখানে দৃষ্ট অদৃষ্ট কত লোকের সহিত মেশামেশি, আলোক ও আঁধারের বিচিত্র মিলনে, অস্পষ্ট, ঈষৎব্যক্ত, অপরিস্ফুট ও অব্যক্ত ছায়াময়ী মূর্ত্তি সকল, ছায়ার জগতে, ছায়ার নাম ধাম ও সম্বন্ধ পাতিয়ে, জীবন্ত-রূপে প্রকাশিত হয় অথচ প্রখর জ্ঞানসূর্য্যের কিরণ-বিস্তারে কোথায় সরে দাঁড়ায়—সেই স্বপ্নরাজ্যে প্রথম মানবের মনে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়। সত্য, ধ্রুবসত্য হলেও একথা 'ধর্ম্মের মূল কোথায়' এ প্রশ্নের সম্যক তলস্পর্শ করতে পারে না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার

কি কখন উন্নতির দ্বার খুলে দেয়? কল্পনা কি কখন যথার্থ সত্য প্রসব করে? তবে এর নিঃসংশয় উত্তর কোথায়? মানুষের ভেতর অদম্য অনন্ত শক্তি কুণ্ডলী আকারে নিবদ্ধ। জন্ম জরা মৃত্যুও সে শক্তির নিকট পরাহত। অনন্ত বাধা বিঘ্ন ভেদ করে দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' রাজ্যে সে শক্তির প্রখর দৃষ্টি ছুটতে সক্ষম। তজ্জন্যই সে সেই নিত্য পদার্থের কিছু না কিছু রূপের ছায়া সকল বস্তুতে দেখতে পায়। তজ্জন্যই সে অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলে ধারণা করে, এবং যে মূহূর্ত্তে মানব সেই মহা-শক্তির সঞ্চালনে, পূর্ণ সত্যের দর্শনে ঠিক ঠিক বাঞ্ছা করবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে সংসারবৃক্ষের উচ্চ শাখায় অবস্থিত, হিরণ্ময়বপু, আদি কবির সত্য ও পরিপূর্ণ-স্বরূপের অবাধ দর্শন লাভ করবে।

মুল বিষয়ে সকল শাস্ত্রই অভেদ

জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ঐ কথাই একবাক্যে ঘোষণা করছে। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, বৌদ্ধের ত্রিপিটক এবং খৃষ্টানের বাইবেলে এখানে মতভেদ নেই। কিন্তু কোন্ পথে অগ্রসর হলে এই চরমোন্নতি লাভ করা যায়, সে বিষয়ে মতভেদ

আছে। স্বর্গ ও সৃষ্টির বর্ণনায় মুক্তি ও মানবাত্মার তৎকালীন অবস্থাবিষয়ে মতভেদ বিস্তর। কিন্তু মানব যে পূর্ণানন্ত স্বরূপ হতে কিছুকালের জন্য এই আপাত অপূর্ণ স্বরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে, এবং ধীরে ধীরে পুনরায় সেই পূর্ণানন্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ বিষয়ে সকলের একবাক্য। ভক্তি বল, যোগ বল, জ্ঞান বল, কর্ম্ম বা নীতি বল, এ বিষয়ে সকলের এক-কথা। জগতের যাবতীয় পুরাণসকলও রূপকের পল্লবিত ভাষায় মানবকে এই কথাই উপদেশ করছে। দেশীয় পুরাণসমূহের কথা তো ছেড়েই দি, বিদেশী য়াহুদি পুরাণ বাইবেলেও আগেই বলছে—প্রথম মানব নিষ্পাপ, পরিপূর্ণ স্বরূপ হয়ে জন্মেছিল; ভগবানের আজ্ঞা অবহেলায় সেই স্বরূপ হতে চ্যুত হয়; আবার তাঁর কৃপায় সেই স্বরূপ লাভ করবে। এখনও যাবতীয় য়াহুদি নরনারী রামধনুর বিচিত্র আবরণে এই আশাপ্রদ কৃপাবাক্য ভক্তিগদগদ হয়ে পাঠ করে। "নিষ্পাপ হও, ভগবদ্ভক্তি বা জ্ঞানলাভে নিরঞ্জনত্ব লাভ কর" একথা ভক্তি বা জ্ঞানশাস্ত্র উভয়েই একবাক্যে বলছে। "কাঁচা আমিকে পাকা করে লও; ইন্দ্রিয়-সংযম ও স্বার্থত্যাগ করে পরার্থ চেষ্টা কর; ভগবানে অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ" একথা ভক্তি ও

বেদান্ত উভয়েই একতানে ঘোষণা করছে। তবে আর মূল বিষয়ে বিরোধ কোথায় ?

পথের বিবাদ মিটবে কিসে ?

বলবে, কথার বিবাদ মিটলেও মিটতে পারে ; ভালবাসা ও সহানুভূতিতে পরকে আপনার করে নিয়ে তার চক্ষে, তার ভাবে তার ধর্ম্ম ও ভাষার অনুশীলনে, কথার বিবাদ একদিন মিটা সম্ভব। কিন্তু পথের বিবাদ যে অতি বিষম। উহা মিটাবার উপায় কি ? কেউ তো কারও পথ ছাড়বে না। আবার পথ ছাড়লেই বা তার ধর্ম্মের উপায় কি ? তার ধর্ম্ম তো এককালে মিথ্যাই প্রতিপন্ন হয়। আবার একধর্ম্ম মিথ্যা হলে অপর ধর্ম্মসমূহ যে সত্য, তারই বা প্রমাণ কোথায় ? পরিশেষে ধর্ম্ম বৃদ্ধাস্ত্রীজল্পনা মাত্র এবং নাস্তিকতাই শ্রেয় এই ধারণা অনিবার্য্য হবে।

না, পথের বিবাদ মিটবারও উপায় আছে। ভারতের পূর্ব্বতন ঋষি ও আচার্য্যপাদেরা এ বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করে গেছেন। ধর্ম্মজগতে তাঁদের দৃষ্টি যে, নামরূপের বিঘ্ন বাধা ভেদ করে যথার্থ সত্যের পরিপূর্ণ স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়েছিল, এতেই

তা প্রতীয়মান হয়। ইহাই তাঁদের প্রাতঃস্মরণীয় উজ্জ্বল গরিমা। ইহাই ধর্ম্মবীরপ্রসবিনী অবতারবহুল, পুণ্যভূমি ভারতের জাতীয় গৌরবের একমাত্র অত্যুচ্চ ধ্বজা। স্বদেশপ্রাণতা, সমাজবন্ধন, রাজনীতি, ব্যবহার-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধান, গৃহরক্ষা, বাণিজ্য এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদি শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদিগকে অবনতমস্তকে ইয়ু-রোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহকে গুরু-স্থানীয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আত্মা, পরলোক-বাদ, ধর্ম্মসমন্বয়, ধর্ম্মপ্রাণতা, গুরু ও ইষ্টনিষ্ঠা এ বিষয়ে আমাদের ঋষি ও আচার্য্যগণ এখন এবং নিত্য-কাল জগতের পূজ্য ও গুরুস্থানীয় থাকবেন; এখন এবং চিরকাল তাঁদের আশাপ্রদ, অমৃতময়ী ঔপনিষদিক বাণী সর্ব্বদেশের নরনারীর চক্ষুপ্রান্ত হতে কামকাঞ্চনের যবনিকা উত্তোলন করে অভয় আনন্দস্বরূপকে দেখিয়ে দেবে; এখন এবং নিত্যকাল তাঁদের সেই 'পূর্ণ-মদঃ পূর্ণমিদং' গম্ভীর নিনাদ বিষয়ের কোলাহল স্তম্ভিত করে নরনারীর প্রাণমন মহাবেগে অনন্ত আনন্দের দ্বারে উত্তোলিত করবে এবং 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' রূপ তাঁদের ঘোষণা, বহুনাম ও বহুপথ যে, সর্ব্বকাল সেই এক নিত্য বস্তুর দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে, চিরকাল এই শিক্ষা নরনারীকে প্রদান করবে।

বিবাদ মিটাবার উপায়,—স্বধর্ম্ম ও ইষ্টনিষ্ঠা

একই গঙ্গা হিমাচলের নীহাররাশি ভেদ করে, শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে, তথা হতে শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্রে, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সাগর-সঙ্গমে প্রবাহিত। শত শত লোক শত শত তীর্থে সেই জলে স্নান পান সমাধা করছে। সকলে নিজ নিজ সন্নিকট তীর্থেই যাচ্ছে। এইরূপে বহুতীর্থ হলেও সকলে সেই একই 'গাঙ্গং বারি মনোহারি' স্পর্শে পবিত্র হচ্ছে। বহুতীর্থ বলে তো বিবাদ হচ্ছে না। তবে ধর্ম্মজগতে পথ নিয়েই বা এত বিবাদ কেন? পথ সকল 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে' সেই এক অখণ্ডচিদানন্দসাগরে মিশছে। এজন্যই ঋষিরা স্বধর্ম্ম ও ইষ্টনিষ্ঠার উপদেশ করেছেন।

মানুষের প্রকৃতি ও মন ভিন্ন ভিন্ন। গাছের একটি পাতা যেমন অপরটির সহিত মেলে না, হাতের একটি অঙ্গুলীর যেমন অপরটির সহিত বিশেষদৃষ্টিতে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ একটি মনের সহিত অপর একটি মনের সর্ব্ববিষয়ে সমতা নেই। প্রত্যেকটির জন্ম-জন্মান্তরীণ কর্ম্মজনিত সংস্কারোপযোগী বিভিন্ন গঠন ও আকার। কোন শরীর ও মনে পশুভাব, আবার

কোনটিতে বা দেবভাব প্রবল। কোনটি বা ভ্রষ্ট তারকার ন্যায় লক্ষ্যচ্যুত, কামকাঞ্চনের আকাশে ছুটোছুটি করছে; আবার কোনটি বা সমুদ্রগর্ভবিদারী পর্ব্বতপুঞ্জের ন্যায় বিষয়ের উত্তাল তরঙ্গকুলের ঘন ঘন ঘাত, অচল অটল ভাবে অকাতরে সহনে সক্ষম। এই অদ্ভুত বিচিত্রতাভূষণ ভিন্ন ভিন্ন মানবের কখন কি এক ধর্ম্ম উপযোগী হতে পারে? রুগ্ন ও সবলকায় সকল বালকবালিকার জন্য মাতা কি কখন একই খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন? শিশু ও যুবার জন্য কখন কি সমপরিমাণ বস্ত্রাবরণ সম্ভবে? অথচ ধর্ম্মজগতে কি এতদিন ঠিক তদ্রূপ চেষ্টাই হয়ে আসছে না? খৃষ্টান পাদরি বলছেন, আমার ঈশাহি ধর্ম্ম তোমার মনের উপযোগী হোক আর নাই হোক, গ্রহণ না করলেই তোমার অনন্ত নরক। মুসলমান বলছেন, আল্লা নামের উপাসনা ও নিরাকার ঈশ্বরে দাসভাবে ভক্তি ভজনা না করলে তোমার এ পৃথিবীতেই বেঁচে থাকবার প্রয়োজন নেই, দেহান্তে স্বর্গলাভ তো বহু দূরের কথা। জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত সকলেরই এই এক কথা। সকলেই বলছেন, আমার ধর্ম্মে সকলকে দীক্ষিত হতে হবে। আমার ধর্ম্ম আমার মনের উপযোগী, অতএব সকল মনের উপযোগী হতেই

হবে। এই তুমুল কোলাহলের ভেতর দিয়ে আর্য্য ঋষির গম্ভীর অন্তঃসারপূর্ণ বাণী আকাশপথে উত্থিত হয়ে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—"স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করো না। আপন আপন প্রকৃতি উপযোগী ধর্ম্ম দোষযুক্ত হলেও ছেড়ো না, জগতে সকল গুণ দোষমিশ্রিত। 'মন মুখ এক করে,' চেষ্টা করলে সকল মতেই আনন্দস্বরূপকে ধরা যায়। সকলেই সমভাবে সেই অমৃতের অধিকারী।" সসাগরা ধরা স্তম্ভিত হয়ে সে আনন্দধ্বনি শুনতে লাগল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই আবার সেই অসার পথ নিয়ে সকলে বিবাদে নিবিষ্ট হল।

ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা—নিঃস্বার্থতা

বাস্তবিক স্বধর্ম্ম ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক ঠিক ধর্ম্মলাভের ও ধর্ম্মজগতে বিবাদ মেটাবার একমাত্র সেতু। অখণ্ড স্বরূপের অনন্ত ভাব, অনন্ত কোটি মানবমনের উপযোগী হয়ে রয়েছে। মানব কটা ভাবই বা তাঁর গ্রহণ করতে পেরেছে? নাস্তিকতা, অবিশ্বাস প্রভৃতি কেন মানবমনে শ্রেয় বলে বোধ হয়? জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয়েছে, যত প্রকার ভাবে মানুষ ভগবানের উপাসনা করেছে, তার

কোনটিও সম্পূর্ণভাবে প্রাণের পিপাসা মেটাতে না পারলেই লোকে নাস্তিক, সংশয়াত্মা হয়ে থাকে। আরও লক্ষ লক্ষ নূতন ধর্ম্ম জগতে উপস্থিত হোক না কেন, মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হবে না। আজ যারা সংশয় সন্দেহ নিয়ে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের শত শত লোক সেই সকল নূতন পথে তাদের মনের উপযোগী ধর্ম্ম ও শান্তিলাভ করে কৃতার্থ হবে। তোমার প্রকৃতি উপযোগী ধর্ম্ম তুমি গ্রহণ কর, আমাকেও আমার প্রকৃতি উপযোগী ধর্ম্ম নিতে দাও। বলবে, তবে তো লম্পট চোরও বলতে পারে, 'আমাদের প্রকৃতি উপযোগী ধর্ম্ম আমাদের করতে দাও।' তা হলে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি থাকে কোথায়? তারও উপায় আছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরীক্ষা করবার একমাত্র কষ্টিপাথর আছে—তাহা নিঃস্বার্থতা।

যেখানে যত স্বার্থ যত আপন শরীর মন অপরের ব্যয়ে সুখে রাখবার চেষ্টা, সেখানে তত আঁধার, তত অধর্ম্ম। আর যেখানে যত পরার্থ চেষ্টা, আপন শরীর মনের ব্যয়ে অপর কাউকে সুখী করবার উদ্যম, সেখানে তত আলোক ও ধর্ম্ম। অতঃপর স্বার্থজীবন দুষ্কৃতকারীদের আর ওকথা বলবার পথ কোথায়? এই নিঃস্বার্থতাই যে সমস্ত নীতিশাস্ত্রের

ভিত্তি, একটু ভেবে দেখলেই সে কথা বুঝিতে পারা যায়। এই নিঃস্বার্থতার ধীর বিকাশেই মানব উচ্ছৃঙ্খলতা হতে নিয়মবন্ধনে এবং তার পূর্ণতায় নিয়মাতীত পরমহংস অবস্থায় উপনীত হচ্ছে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় ব্যক্তিসমষ্টি সমাজ ও সমাজসমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডও এই নিয়মে উন্নতির পরাকাষ্ঠার দিকে ছুটেছে।

সমাজের আদর্শ

নিয়মের সম্পূর্ণ অভাব হতে নিয়ম এসে ব্যক্তি ও সমাজমন অধিকার করছে এবং নিয়মের পূর্ণত্ব আবার নিয়মাতীত অবস্থায় তাদের উত্তোলন করে শৈশবের বিবেকরহিত মূঢ়তাকে বার্দ্ধক্যের বহু-দর্শিতা এবং পরিশেষে যোগীর সংযমসহজাবস্থায় পরিণত করছে। সেরূপ অনীতি, নীতি ও নীতির অতীতাবস্থারূপ সোপানপরম্পরায় ব্যক্তি ও সমাজমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। বলতে পার, যুগারম্ভ হতে পৃথিবীতে কিয়ৎসংখ্যক ব্যক্তি ভিন্ন এখনও এমন কোনও একটি সমাজ দেখা যায়নি, যাতে সমাজাঙ্গ সমস্ত ব্যক্তিই এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। উত্তরে বলা যেতে পারে, মস্তক, হস্ত,

পদাদির সমষ্টিতে যেমন এক সম্পূর্ণ ব্যক্তি, সেইরূপ ব্যক্তিসমূহের সমষ্টি সমাজকেও এক সুমহান্ শরীর ও মনবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি যে নিয়মে চালিত ও পুষ্ট হয়ে উন্নত হতে থাকে, অপরটিও ঠিক সেই নিয়মে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। একটিকে যদি এই পরিপূর্ণ আদর্শ অবস্থায় উপনীত হতে দেখে থাক, অপরটিও কালে সেই অবস্থায় এসে দাঁড়াবে, একথা কি এতই অসম্ভব বলে বোধ হয়? সমাজের এই আদর্শ অবস্থা সকল কালেই চিন্তাশীল মনীষিগণ কল্পনায় চিত্রিত করেছেন। একেই সত্যকাল, সুবর্ণযুগ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সর, লে কণ্ট, ফিস্ক প্রমুখেরাও এটা বিজ্ঞানবিরোধী বা অযুক্তিকর বলে স্বীকার করেন না।

জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য এবং ইষ্ট-নিষ্ঠা

জ্ঞান ও ভক্তির দুটি পথমাত্র। একটি 'সোঽহং সোঽহং' এবং অপরটি 'নাহং, নাহং' করে মানবকে সত্যস্বরূপে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ্য বস্তু যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সাধকের নিকট উভয় পথ এবং পথের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হয়ে

থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই আর সাধকের নিকট সে ভিন্নতা প্রতীত হয় না। তার বিশদ সাক্ষ্য বেদের 'তত্ত্বমসি', সুফীর 'আনলহক্' ও খৃষ্টের 'আমি ও আমার পিতা এক।' তার উজ্জ্বল প্রমাণ—ভক্তিপ্রাণা ব্রজগোপিকাদের ভক্তির উন্মত্ততায় শারদোৎ-ফুল্লমল্লিকারজনীতে গহনকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভিনয়। তবে পথিক সাধকের আপন পথে নিষ্ঠা রাখা আবশ্যক। বাতাত্মজ, বীরাগ্রণী শ্রীরামদূতের ন্যায় তাঁর প্রাণ যেন নিরন্তর বলে,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

জানি আমি, সেই এক পরমাত্মাই শ্রীনাথ ও জানকীনাথ উভয় রূপে প্রকাশিত, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব ধন। পরমহংসদেব তাঁর সেই মধুর ভাষায় বলতেন, "ইষ্টনিষ্ঠা যেন গাছের গোড়ায় বেড়া দেওয়ার মত। ছোট গাছের গোড়ায় বেড়া না দিলে, লোকে মাড়িয়ে ফেলে; ছাগল গরুতে মুড়িয়ে খায়। সেই জন্য বেড়ার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু গাছ বড় হয়ে গুঁড়ি বাঁধলে আর বেড়ার দরকার নেই। তখন সে গাছের গুঁড়িতে হাতি বেঁধে রাখলেও আর তার কিছুই অপকার হয় না।"

বেদান্ত কি ভগবানলাভের একটি পথ মাত্র

তবে কি 'বেদান্ত' ভগবান লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথের একটি পথমাত্র? 'হাঁ' এবং 'না' উভয়ই বটে। জন-সমাজে, এমন কি, পণ্ডিতসমাজেও একটা ধারণা হয়েছে, বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ একই কথা। 'সোঽহং সোঽহং' করে সেই দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত সত্যলাভ করবার পথমাত্র বেদান্ত। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'বেদান্ত' অর্থে যদি বেদের শেষ উপনিষদ্‌ভাগই বোঝা যায়, তা হলেও তো সেই ভাগে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত এ তিন মতের উপযোগী বচনপরম্পরা দেখতে পাওয়া যায়। অধিকারিভেদে উপদেশ করে বিশেষ বিশেষ স্থানে বেদ তো এ তিন মতেরই প্রাধান্য স্থাপ করেছেন দেখা যায়। আবার 'বেদান্ত' অর্থে যদি বেদের সার কথা বুঝতে হয়, তা হলে অদ্বৈতজ্ঞানেরও পারে অবস্থিত বস্তুকে লক্ষ্য করে বেদ অদ্বৈত মতই কেবল প্রচার করেছেন একথা বলায় বেদে অসম্পূর্ণতা দোষ উপস্থিত হয়। তবে এর মীমাংসা কোথায়? মীমাংসা ঠিক এইখানে। বেদ বাক্যমনের অতীত বস্তুই উপদেশ করেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যে

মনুষ্যের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত ক্রমশঃ এসে উপস্থিত হয় এবং এই সোপানপরম্পরা অবলম্বন করে মানব কালে সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি করে। সোপানের প্রত্যেক অঙ্গটিই আবশ্যকীয়। একটি না থাকলে অপরটিতে উঠা যায় না। সেইরূপ এ তিনটি মতই পরস্পরের সহায়—অবস্থাভেদে মানবের স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়। দেশকালের সীমার মধ্যে নাম রূপের রাজত্বে প্রাপ্ত যত কিছু সত্যের ন্যায় এই মতত্রয়ও অবস্থাভেদে সমান সত্য বলে প্রতীত হয়। এ তিন মতই বেদান্তের অন্তর্ভূত। জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম কি প্রণালীতে মানুষকে ধীরে ধীরে নামরূপের পারে নিয়ে উন্নতির চরম সোপানে পরম সত্য দর্শন ও উপলব্ধি করাচ্ছে—সেই প্রণালীনির্দ্দেশই বেদের সার কথা এবং তা-ই বেদান্ত। এজন্যই বেদ ও বেদান্তজ্ঞান, কোন বিশেষ পথ বা বিশেষ মত নয়; কিন্তু সমস্ত মতের—সমস্ত ধর্ম্মের সারভূত বস্তু। এই জন্যই বেদান্ত সার্ব্বভৌমিক দর্শন বলে সকলের শীর্ষ-স্থানীয় হয়েছে, এবং ধর্ম্মের প্রথম অঙ্কুর হতে শেষ পর্য্যন্ত উন্নতি-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট থাকায় বেদ 'পুরুষ-নিশ্বসিতম্'—ভগবানের সহিত নিত্যকাল বর্ত্তমান ইত্যাদি হয়ে হিন্দুর চক্ষে নিত্যকাল মাননীয় হয়ে রয়েছে।

জ্ঞান ছাড়লে ধর্ম্মলাভ হয় না

বেদান্তের আর একটি কথা—জ্ঞান ছাড়লে ধর্ম্ম-লাভ হবে না। ভক্তিশাস্ত্রে অহেতুকী ভক্তিই প্রধান ও উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত থাকলেও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই যে তা লাভের উপায়, একথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। ভক্তির প্রধানাচার্য্য-প্রমুখেরাও একথা বুঝিয়ে গিয়েছেন। চৈতন্যদেবও গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথনের সময় একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজকাল অনেকেই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে একেবারে অহেতুকী ভক্তিলাভ করতে প্রয়াসী হন। বলা বাহুল্য যে, ইহা তাঁদের বাতুলের চেষ্টার ন্যায় কখনই অভীষ্ট ফল প্রদান করবে না।

উপসংহার—আচার্য্যদেবের উপদেশ

পরিশেষে সেই গঙ্গাবারিবিধৌত বিশাল উদ্যানে 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' 'শবশিবারূঢ়া' মূর্ত্তির তন্ময় সেবক, সেই মাধবীহারগ্রথিত চিরপরিণীত অশ্বত্থ-বটের নিবিড় আলিঙ্গননিবদ্ধ পঞ্চবটীতলস্থ তপস্যাজাগ্রত সাধনকুটীরে ধ্যানশীল বাল-স্বভাব, সরলতা মাধুর্য্য ও তেজের অপূর্ব্ব সম্মিলন আচার্য্যদেব, যাঁর উপদেশের প্রতিপংক্তিতে বেদ বেদান্ত, দর্শনের নিগূঢ় ও জটিল সত্য সকল

জীবন্ত ও জ্বলন্ত হয়ে হৃদয়ের সংশয় ছিন্ন করে সুকুমারমতি বালকেরও মর্ম্মস্থল স্পর্শ করত—তাঁরই দু চারটি কথা স্মরণ করে আমরা আজ উপসংহার করি।

"ভক্ত হবি, কিন্তু তা বলে বোকা হবি কেন? বোকা হলেই কি ভগবানে বেশী ভক্তি হবে?"

"ভক্ত হোস্, কিন্তু গোঁড়া বা একঘেয়ে হোস্‌নি। একঘেয়ে হওয়া অতি হীনবুদ্ধির কাজ।"

"যত মত তত পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রাখিস্, কিন্তু অপরের মতের দ্বেষ বা নিন্দা করিস্ না।"

অষ্টম অধ্যায়

সাধনা ও সিদ্ধি

(কোন্নগর হরিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

আমরা একটু স্থির চিত্তে আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাই যে, সমস্ত শাস্ত্রই এক কথা ও একই লক্ষ্য বলেছে। সব শাস্ত্রে একই কথা বটে, তবু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্‌লে লোকের রুচিকর হয়। সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে সেই শাস্ত্রেরই দু চারটি কথা আজ আমরা একটু অন্যভাবে আলোচনা করব। সাধারণতঃ লোকে বলে, "যেমন সাধন, তেমন সিদ্ধি।" শাস্ত্রেও আছে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যার যেমন ভাবনা, তার তেমনি সিদ্ধি হয়। সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে কার্যকারণগত নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। যিনি যে বিষয়ে চেষ্টা করবেন, তিনি তাতেই সিদ্ধ হবেন। আমাদের ধর্ম্ম, বক্তৃতা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জিনিষ নয়; অনুভূতির জিনিষ। অধিকারিভেদে ও মনের অবস্থানুসারে সাধনপ্রণালী অনেক হতে পারে এবং এইটিই ধর্ম্মরাজ্যে নানা সম্প্রদায় হওয়ার কারণ।

আমাদের দেশে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাদিগকে বিশ্লেষণ করে দেখ্‌লে চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা—জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত ও যোগী। যাঁরা সমস্ত বিষয় ও বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁরা জ্ঞানপথ অবলম্বন করেন। আর যাঁরা সংসারে বিষয় ও বৈষয়িক কর্ম্মের মধ্যে থেকে নিজেদের অল্প শক্তি প্রত্যক্ষ করে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁরা ভক্ত। যাঁরা কর্ম্ম করেন, তাঁরা কর্ম্মী। আর এক দল লোক আছেন, যাঁরা একাগ্রতা সহায়ে মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে সমস্ত বাসনাবীজ দূর করে দিতে চেষ্টা করেন, তাঁরা যোগী।

আমাদের বাংলা দেশে ভক্তির চর্চ্চাই অধিক। অন্যগুলি আমরা বুঝি না। আমরা নিজেদের অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে করে থাকি, এটি আমাদের মহাদোষ। নিজেকে যতই দুর্ব্বল ও পাপী মনে কর্‌ব ততই আমরা দুর্ব্বল হতে থাক্‌ব। অহঙ্কার যেমন লোকের পতনের কারণ হয়, সেরূপ "আমি দুর্ব্বল, আমি পাপী" এ বিশ্বাসও মানবকে ধীরে ধীরে উত্থানশক্তিরহিত করে উন্নতি পথের অন্তরায় হয়; অতএব দুটিই পরিত্যজ্য, একথা পরমহংস-দেব বল্‌তেন। কোন সময়ে তাঁকে একখানা বাইবেল

পড়ে শুনান হয়েছিল। তাতে প্রথম হতেই কেবল পাপ-বাদের কথা। কতকটা শুনে ওতে কেবল পাপের কথা দেখে আর শুন্‌তে অস্বীকার কর্‌লেন; তিনি বল্‌তেন, "যেমন সাপে কামড়ালে বার বার, বিষ নেই, বিষ নেই বলে রোগীর বিশ্বাস জন্মাতে পারলে সত্যই বিষ থাকে না, সেই রকম আমি ভগবানের নাম নিইছি, আমার পাপ নেই, বার বার একথা আপনাকে বলতে বলতে সত্যই পাপ থাকে না।" "আমি পাপী, আমি দুর্ব্বল" এরূপ ভাব আমাদের ভেতর থেকে যত যাবে, ততই ভাল। সকল মানুষের মধ্যেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান বিদ্যমান। আমরা ভগবানের অংশ, ভগবানের ছেলে, আমরা আবার দুর্ব্বল? সেই অনন্ত শক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের শক্তি আসছে, আমরা আবার পাপী? অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ হচ্ছে, নিজেকে পাপী ও দুর্ব্বল মনে করা। এ অবিশ্বাসী নাস্তিকের কাজ। যদি কিছু বিশ্বাস কর্‌তে হয়, তবে এই বিশ্বাস কর যে তোমরা তাঁর ছেলে, তাঁর অংশ, তাঁর অনন্ত শক্তি ও অপার আনন্দের অধিকারী। বিশ্বাস কর যে, তোমার শরীর ও মন হচ্ছে পবিত্র দেবমন্দির, যেখানে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ভগবান চিরপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস কর যে, প্রত্যেক নর নারীর মধ্যে তিনি, বৃক্ষলতায় তিনি—জড়চেতনে

তিনি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ভিন্ন আর কেউ নেই
আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে, নারীর মুখ
চ্ছায়ায়, বালকের সরলতায়, শ্মশানের করালতায় এব
যোগীর নিস্পন্দতায় তাঁরই প্রকাশ দেখ্‌তে চেষ্টা কর
এই চেষ্টাই যে এক প্রকার সাধন।

গীতার ১০ম অধ্যায়ে আমরা এই ভাবটি স্পষ্ট দেখ্‌তে
পাই। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে
ইন্দ্রিয়াদি কামকাঞ্চনমোহিত, তাদের আকর্ষণে মানু
রূপরসাদির পশ্চাৎ গমন কর্‌ছে, অথচ আমরণ মানবকে
জগতের ব্যাপার নিয়েই থাকতে হবে; অতএব তা
বাঁচবার উপায় কি? ভগবান উত্তর করেন—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, তা আমারই তেজের
অংশ। চন্দ্র, সূর্য্য, পশু, পক্ষী ও জগদ্‌বিমোহিনী স্ত্রী
মূর্ত্তিতে যা কিছু সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পাও, সমস্তই তাঁর
তেজের অংশ। তাঁর জ্যোতি এই সকল মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে
প্রকাশ হচ্ছে। মানুষ বাস্তবিক এদের প্রকৃত স্বরূপ
অবধারণ করতে পারে না বলেই বিষয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে।
ভগবান গীতায় আবার বলছেন,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

হে অর্জ্জুন, আমার বিভূতির বিষয় আর কত বলব, আমিই একাংশে এই ব্রহ্মাণ্ড হয়ে রয়েছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অমৃতময়ী বাণীই কি আমাদের বলছে না যে, আপনাকে এবং অপরকে পাপী বলে ধারণা করতে নেই? এতেই কি আমাদের শেখাচ্ছে না যে, মানুষকে দেবতা বলে, ভগবানের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বলে ধারণা কর? নিজেরা এইটি শেখ এবং সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী সকলকে শেখাও। আমরা মুখে বলছি এক, কাজে করছি আর এক। মন মুখ এক না করতে পারলে সমস্ত রাত্রি হরি হরিই কর অথবা সমিতিই কর, কিছুতেই কিছু হবে না। এই ত দেখ্‌ছি, ঘরে ঘরে হরিসভার ধুম অথচ কিছু দিন পরে আর কেউ আসতে চায় না।

এর কারণ কি? কারণ এই, আমাদের মন মুখ এক নেই। ধর্ম্মের প্রথম সাধন হচ্ছে, মন মুখ এক করা। পরমহংসদেব বলতেন, "মন মুখ এক করাই প্রধান সাধন।" মন মুখ এক করেছে, এরূপ লোক কোথায়? হাজারটা খুঁজলে কটা পাওয়া যায়? প্রত্যেক কাজেই দেখ্‌ছি মনে এক, মুখে আর। অতি সামান্য একটি কাজ

করতে পারিনি, বড় কাজ করতে দৌড়ুই। সম্মুখে পিপাসার্ত্তকে একটু জল দিতে পারিনি, অথচ সমিতি করতে সকলকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা অথবা সমস্ত অভাব দূর করে দেশোদ্ধার করতে যাই। মন ও মুখের বিপরীত গতির দৃষ্টান্ত দেখুন। চণ্ডীতে আছে,—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

হে দেবি! যত কিছু বিদ্যা আছে, তা তোমারই শক্তির প্রকাশ মাত্র, আর জগতের যত স্ত্রীমূর্ত্তি আছে, তোমারই মূর্ত্তি। আমরা সকলে চণ্ডী পাঠ করছি কিন্তু আমাদের মধ্যে কজন আছেন, যিনি স্ত্রী-লোককে দেবীর প্রতিমা বলে দেখছেন? কত লোক এক দিকে চণ্ডী পাঠ করেন, আবার পাঠান্তে সামান্য কারণে স্ত্রীকে প্রহার পর্য্যন্ত করতে সঙ্কুচিত হন না। স্ত্রীলোককে দেবীর মূর্ত্তি বলে সম্মান ও পূজা করার পরিবর্ত্তে তাদের সন্তান প্রসব ও রন্ধনাদি করবার যন্ত্র-বিশেষ মাত্র ধারণা করে রেখেছেন।

বৈদিক যুগে কত স্ত্রীলোক ঋষি ছিলেন। বৃহদা-রণ্যক উপনিষদে দেখতে পাই, জনক রাজার সভায় গার্গী নাম্নী জনৈকা সন্ন্যাসিনী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কত গভীর প্রশ্ন করছেন। লীলা, খনা

প্রভৃতি আরও কত বিদুষী স্ত্রীর কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

অল্প দিনের কথা, অহল্যাবাঈ-এর অদ্ভুত জীবন অনেকেই জানেন। তিনি নিজেই রাজ্য শাসন করতেন। প্রত্যেক বড় বড় তীর্থে তাঁর কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান। এমন কি, পাহাড়ের বিজন প্রদেশে পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য তাঁর নির্ম্মিত রাস্তা অদ্যাপি তার পরিচয় দিচ্ছে। যাদের মধ্যে জগজ্জননীর অপূর্ব্ব শক্তি নিহিত তাদের আমরা দাসী মাত্র করে রেখেছি! কেবল পূজাদির সময় দুই এক বার বলে থাকি মাত্র যে, সমস্ত স্ত্রীলোকই মা ভগবতীর মূর্ত্তি!

আরও দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে আছে এবং আমরা বলেও থাকি যে, সকল মানুষই নারায়ণের মূর্ত্তি। কিন্তু কার্য্যতঃ কি করি? একজন মেথর বা নীচজাতীয় ব্যক্তিকে দেখলে অমনি তাকে ছাগল গরু অপেক্ষাও ঘৃণা করতে সঙ্কুচিত হই না। মানুষের চেয়ে গরুর সম্মান যারা অধিক করে থাকে, তাদের বুদ্ধি ধারণা আর কত দূর অগ্রসর হবে? শাস্ত্রে বিশ্বাস করলে, আমাদের কর্ত্তব্য, নিজেকে কখনও দুর্ব্বল মনে না করা এবং অপরকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করা। আমাদের ভাবা উচিত যে, আমরা তাঁর অংশ তাঁর ছেলে; আমাদের এই

শরীর এবং সমস্ত শরীরই তাঁর মন্দির। যেমন হিমালয় থেকে গঙ্গার সমস্ত জলরাশি আস্ছে তেমনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের সমস্ত শক্তি আসছে। এইটি দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে ক্রমে উঠতে পারব। জগতে যেখানেই জ্ঞানের চর্চ্চা হয়েছে, সেখানেই লোকে বুঝেছে যে, মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। অনেক সময় সৎকার্য্যের উদ্যম করতে বা পরোপকারের কোনরূপ চেষ্টা করতে বল্লে উত্তর পাওয়া যায়, আমাদের টাকা কোথায়, টাকা না থাক্লে কি কোন কাজ হয়? আরে নির্ব্বোধ! বল যে, আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, মানুষ হলে টাকা যে তার পায়ের কাছে আপনি এসে পড়্বে। টাকায় কখনও মানুষ করে না, কিন্তু মানুষই টাকা উপার্জ্জন করে। আজ থেকে সমস্ত দুর্ব্বলতা ফেলে দিয়ে মানুষ হতে চেষ্টা কর। নিজেকে দুর্ব্বল ভাব্লে অন্তর্নিহিত ভগবৎশক্তি বিকাশ না হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। বিশ্বাস কর যে, তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সুকর্ম্ম ও সুচিন্তা দ্বারা সেই শক্তির বিকাশ কর।

অতএব আমাদের প্রথম সাধন, নিজেকে দুর্ব্বল না ভাবা এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার হাত থেকে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা। দ্বিতীয় সাধন, মন মুখ এক

করা। গীতায়ও বিশেষ বিশেষ অধিকারীর জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনার উপদেশ করবার পূর্ব্বে সর্ব্বাবস্থায় সকলেরই প্রয়োজনীয় এই দুই সাধনার উপদেশ দেখতে পাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ সৈন্যদলে আত্মীয় স্বজন ও ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে অর্জ্জুনের মনে যুগপৎ শোক, দুঃখ, মোহ ও ভয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ভয় মোহ প্রভৃতি ভাব লুকিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে, সামান্য রাজ্যের জন্য আত্মীয় স্বজনদিগকে হিংসা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবন ধারণও শ্রেয়। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য-বোধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন ও মহাবীরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে মোহ ও ভয় বশতঃ সেই কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে মুখে ধর্ম্ম ভানে নানা প্রকার অসম্বন্ধ বাক্য বলছেন। কিন্তু কার কাছে মনের ভাব লুকুবেন? ভগবান অন্তর্য্যামী। তিনি বল্‌লেন,—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

'হে অর্জ্জুন! তোমার মত লোকের ত এরূপ দুর্ব্বলতা সাজে না। তুমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ত্যাগ

করে ওঠ।' দুর্ব্বলতা হতে যত নীচতা আসে; ইহাই পাপের খনি। কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা কি হবে? যাতে আবালবৃদ্ধবনিতার শরীর ও মন সবল হয়, তার যত্ন করাই প্রকৃত শিক্ষা।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, ধর্ম্মলাভ কর্‌বার চারটি পন্থা। বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, এই চারটি মানবকে এক স্থানেই নিয়ে যায়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি পড়লে ইহাই দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উহা লাভ করবার নানা পথ এবং যত পথ, তত মত। আমাদের প্রতিদিন পাঠ্য মহিম্নস্তবে এই ভাব শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

'হে ভগবান! বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি মতগুলি বিভিন্ন হলেও তোমাতে যাবার এক একটি পথ মাত্র। লোকের রুচি অনুসারে সরল ও জটিল যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, তুমিই সকলের গম্যস্থান।' পরমহংসদেব বল্‌তেন, "যেমন কালীঘাট যাওয়ার হচ্ছে পথ, সেইরূপ নানা মত ভগবানে

যাওয়ার এক একটি পথ মাত্র।" ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারাপন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত ও সাধনপ্রণালী শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত, আপাত-বিরোধী হলেও বাস্তবিক তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, গম্যস্থান বা লক্ষ্য একই।

সাধনা শব্দের অর্থ ভগবৎপাদপদ্ম দর্শনে পূর্ণমনস্কাম মহাপুরুষগণের যে প্রকার অবস্থা বা অনুভূতি হয়, তাই আপনাতে আন্‌বার বা তাঁদের মত হবার জন্য চেষ্টা করা। সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ ভগবান গীতায় বলেছেন,—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

'মনোগত সমস্ত কামনা ত্যাগ করে যিনি আত্মা বা ভগবান মাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, সুখ দুঃখ বা শরীর মনের নানাপ্রকার নিত্য পরিবর্ত্তন যাঁকে বিচলিত কর্‌তে পারে না, তিনিই স্থিরবুদ্ধি ও মুক্ত।' যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেল্‌তে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ তাঁদের কাম কাঞ্চন ত্যাগ স্বতঃই হয়ে থাকে। তাঁদের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি এমন ভাবে গঠিত হয়ে গেছে যে, তাঁদিকে আর বিপথে চল্‌তে দেয় না। সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ বা সিদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের অধিক

বলবার দরকার নেই, কারণ, এখনও আমরা সিদ্ধি লাভের অনেক দূরে রয়েছি। আমাদের প্রয়োজন এখন, যত প্রকার সাধনা বা উপায়ে ভগবান লাভ করা যায়, তা জানা এবং তার মধ্যে বিশেষ একটি নিয়ে নিজ জীবন গঠন করা।

পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় সত্য যাতে সাধারণে না পড়তে পায়, এই ভাবে লুকিয়ে রাখা হতো। এতে পুরোহিতের আধিপত্য অটুট রইল, কিন্তু জাতীয় জীবন বিদ্যাহীন হয়ে অনেক নিচে পড়ে গেল। পুরোহিত তাঁর ঈদৃশ কার্য্যের কারণ দেখালেন যে, অধিকারী হবার পূর্ব্বে মানুষকে সকল সত্য বললে অনেক সময় না বুঝে উল্টো উৎপত্তি হয়ে থাকে, যেমন বেদান্ত ঠিক না বুঝলে অনেক সময় নাস্তিক্য এসে মানুষকে অধিক বিষয়-পরায়ণ করে থাকে। এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে, তোমার যখন অধিকারী চেনবার শক্তি নেই, তখন সকলকেই পড়বার ও আলোচনা করবার ক্ষমতা দাও। সে নিজেই তার উপযোগী পথ বেছে নেবে। আজ কাল সমস্ত শাস্ত্র মুদ্রিত হচ্ছে, এ সময় লুকোবার চেষ্টাই বৃথা।

আমরা এখন দেখবো, জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী ও কর্ম্মী এই চার প্রকার সাধকেরা কোন্ কোন্ প্রধান সাধন সহায়ে

চরমে একই স্থানে উপস্থিত হন। জ্ঞানী সদসৎ বিচার করে অনিত্য বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার ভেতর নিত্য বস্তু কোন্‌টি, তার অন্বেষণে নিযুক্ত থাকেন এবং সেই বস্তুকেই প্রকৃত আমি বলে নির্দ্দেশ করেন। শরীর মনে আবদ্ধ, বিষয়বাসনাযুক্ত ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ করে এই মহান্ আমি হয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য। জ্ঞানীর সাধন "নেতি নেতি" বিচার এবং স্বস্বরূপের ধ্যান। জ্ঞানী বলেন, বিচারে অনিত্য বলে যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে, তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর। এইরূপে দেখ্‌বে, শরীর মন প্রভৃতি কোনটিই নিত্য নয়, এই সকলের চিন্তা বাসনা দূর করে দিতে পারলে নিত্যবস্তু আত্মার সাক্ষাৎকার এবং তাঁতে অবস্থান। আবার একবার তাঁতে অবস্থান করতে পারলেই দেখ্‌বে, সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, লীলা নিত্যের সহিত চির সম্বন্ধে গ্রথিত। সেই জন্যই জ্ঞানী বলেন, জগতে যা কিছু দেখতে পাই, সমস্তই আত্মার বিকাশ, আত্মা মাত্র এবং আমি সেই আত্মা। এইটি সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখাই জ্ঞানীর প্রধান সাধন।

যোগী বলেন যে, মনুষ্য জন্ম জন্ম বিষয়ের সহিত আপনাকে একীভূত করে কতকগুলি সংস্কারের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং সেজন্য কতই না কষ্ট পেয়ে থাকে।

কিছুতেই আর আপনাকে তাদের হাত থেকে ছাড়াতে পারে না। যোগী ছাড়াবার উপায় সম্বন্ধে বলেন, স্থির হয়ে বস, আপনাকে ভুলে কোন চিন্তার পশ্চাৎ যেও না, মনকে চিন্তা করতে দাও এবং তুমি সাক্ষিস্বরূপ হয়ে স্থিরভাবে মনের তরঙ্গভঙ্গ দেখ্‌তে থাক। পরে মনকে কোন এক বস্তুবিশেষে নিবদ্ধ করে তাতেই একাগ্র কর। এই একাগ্রতাই সংস্কারবীজ দগ্ধ করে সত্য প্রকাশ করে দেবে। যথার্থ একাগ্রতা আসলেই তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন। অতএব দেখা গেল, যোগীর প্রধান সাধন, সর্ব্বাবস্থায় আপনাকে সাক্ষিস্বরূপ ধারণা করা এবং মনকে কোন এক বিষয়ে সম্পূর্ণ একাগ্র করা।

ভক্ত বলেন, ভগবানে আপনাকে সম্পূর্ণ ফেলে দাও, তাঁর সঙ্গে কোনও এক বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন কর। পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, স্বামী প্রভৃতি যে কোন সম্বন্ধ তোমার ভাল লাগে, সেই সম্বন্ধ স্থাপন কর। শরীর, মন, স্ত্রী, পুত্র যা কিছু তোমার আছে, সমস্ত তাঁকে অর্পণ কর। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যাঁকে দেখতে পাই না, তাঁর সঙ্গে কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন করব? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যাঁর কাছে গেলে তুমি প্রাণে শান্তি পাও, তাঁকেই মানুষ বোধ না করে ভগবান বোধে

পূজা কর। তাহলেই ভগবানের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হবে।

পরমহংসদেবকে একদিন জনৈক স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করেন যে, মন কিছুতেই স্থির হয় না, কেবল ভ্রাতুষ্পুত্রের চিন্তা মনে আসে। তিনি উত্তরে বলেন, "তাকেই ভগবান বোধে চিন্তা ও সেবা কর।" কিছুদিন এইরূপ করাতে স্ত্রীলোকটির মন সমাধিস্থ হয়। তাঁর সঙ্গে যতদিন না কোন বিশেষ সম্বন্ধ হবে, ততদিন তাঁকে আপনার বলে বোধ হবে না এবং ভালবাসা জমবে না। রামপ্রসাদ বলেছেন,—

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে
কি ধরতে পারে।
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমনে,
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে, একেবারে তাঁর হয়ে গেলে স্বার্থপূর্ণ আমিত্ব বিনষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন আসবে।

কর্ম্মী বলেন, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর, ফল তাঁতেই অর্পণ কর। স্বার্থের জন্য কর্ম্ম কর না; স্বার্থই মৃত্যু। সর্ব্বদা কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মফলে আসক্ত হয়ো না। পূজা ও সাধনা-স্বরূপ কর্ম্ম কর। ধন, মান, যশের

জন্য করো না। সেই বিরাট পুরুষের সেবার জন্য কর্ম্ম কর। তিনিই নানারূপে জগতে খেলা করছেন। তোমাদ্বারা তাঁর একটু সেবা হলে আপনাকে ধন্য মনে কর। এই প্রকারে কর্ম্ম করলে যে ক্রমে স্বার্থ নাশ ও আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হবে, একথা আর বলতে হবে না।

চার শ্রেণীর লোকের জন্য চার রকম সাধনা নির্দ্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দেশ্য একই, স্বার্থপর আমিত্বকে বিনাশ করা। ভেবে দেখলে এদের মধ্যে বিবাদ কেবল কথার মাত্র। বাস্তবিক কোন বিবাদ নেই, স্বার্থপর আমিত্ব গেলেই মুক্তি। পরমহংসদেব বলতেন, "মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে," "পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।" যখন অবিদ্যার আমি যাবে, তখনই শিবত্ব প্রাপ্তি ও মুক্তি। পরমহংসদেব বলতেন, "যেমন জলকে নানা লোকে নানা নামে বলে, সেই রকম এক ভগবানকেই নানা নামে লোকে ডাকে।"

এইগুলিই প্রধান প্রধান সাধনার কথা। জীবন গঠনে এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য এদের বিশেষ প্রয়োজন। মন মুখ এক করে যার যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর এবং আজ থেকে নিজ জীবন গঠনে কৃতসংকল্প হও। আর যা কিছু দরকার তিনিই সব এনে দেবেন।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

মন মুখ এক করে তাঁর শরণাপন্ন হলে দুর্ব্বলতা পাপ কিছুই থাকতে পারে না। তিনিই সব থেকে রক্ষা করেন। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তাঁর নামের জোরে আমাদের সকল দুর্ব্বলতা ও পাপ চির কালের মত দূর হয়েছে, এই বিশ্বাসটি যেন আজ থেকে আমাদের সকলের হয়।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

নবম অধ্যায়

বেদ-কথা

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা—রবিবার ৭ই আগষ্ট,

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ)

এই সভাতে বেদাদি সম্বন্ধে সে সকল কথা বলা হবে, তা কথাবার্ত্তাচ্ছলে বলব, বক্তৃতার ভাষায় বললে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে দূরত্ব অনুভব হবে। আমরা ভাবব, আমরা সকলে একসঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা করতে এখানে একত্রিত হয়েছি এবং পরস্পারের সন্দেহ সকল প্রশ্নদ্বারা বিচারপূর্ব্বক মীমাংসা করে সত্যলাভ করব। মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবন আলোচনা করে দেখলে, বেদোক্ত ধর্ম্মাদি সহজে উপলব্ধি হয়, সেই জন্য উহাও আমাদের আলোচ্য হবে। আবার অন্যান্য মহাপুরুষদিগের অস্তিত্ব অথবা পুরাণনিবদ্ধ চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ঐরূপ হতে পারে না; কারণ আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছি। অতএব তাঁর চরিত্রে বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম

কিরূপে কিভাবে প্রকাশিত ছিল, তাও সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করব। প্রথমে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হতে কিছু পাঠ করি—

এক সময়ে মিথিলার রাজা জনকবিদেহ এক যজ্ঞ করেছিলেন, এই মিথিলা-রাজবংশের কোন রাজা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাতে, তাঁদের বংশের উপাধি—বিদেহ হয়েছিল। এই যজ্ঞে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। রাজা জনক এক সহস্র গাভী দক্ষিণা দেবেন মনস্থ করে তাদের শৃঙ্গ স্বর্ণদ্বারা মুড়িয়ে দিয়ে বললেন, আপনাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই গাভী গ্রহণ করুন। কেহই অগ্রসর হলেন না। কাকেও অগ্রসর হতে না দেখে অবশেষে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় শিষ্যদিগকে বললেন, তোমরা এই গাভী সকল আমার নিমিত্ত গ্রহণ কর। একথা শুনে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বললেন, ইনি আমাদের অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ, তা বিচার করা যাক; আমাদের অপেক্ষা যদি ইনি কিছু অধিক জানেন, তা হলে এঁকে গাভী দেওয়া যাবে। এইরূপ স্থির হলে গার্গী নাম্নী একটি স্ত্রীলোক সভায় দণ্ডায়মানা হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। নানাবিষয়ের যথাযথ উত্তর করে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে নিরস্ত হতে বললেন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের

সহিত বিচার আরম্ভ করলেন। অবশেষে গার্গী আবার বললেন, আমি আর দুটি প্রশ্ন করতে চাই, যদি যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তর দিতে পারেন, তাহলে, বুঝব, এঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারবেন না। প্রথম, কার দ্বারা এই সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং দ্বিতীয়, তিনি কে? যাজ্ঞবল্ক্য ঐ দুই প্রশ্নের উত্তর করলে গার্গী বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এঁকে পরাস্ত করতে পারবেন না; কারণ ইনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, এবং এঁর জানবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

দেখা গেল, বেদোক্ত ব্রহ্মকে জানলে লোকে সর্ব্বজ্ঞ হয়। এখন দেখা যাক বেদ কাকে বলে? বেদ অর্থে জ্ঞান; যে জ্ঞান লাভ হলে, জগতের সমস্ত বিষয় জানতে পারা যায়; যেমন, মৃত্তিকা কি জানলে মৃত্তিকার বিকারপ্রসূত সরা, খুরি ইত্যাদি সমস্ত পদার্থকেই জানতে পারা যায়, সেইরূপ যে বস্তুকে জানতে পারলে সৃষ্টির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থকে জানতে পারা যায়, আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না, সেই জ্ঞানই বেদ। এই জ্ঞানলাভের অধিকারী কে? বেদের অধিকারী কে? শাস্ত্রে কেবল দ্বিজমাত্রকেই অধিকারী বলে নির্দ্দেশ করেছেন; গীতা ও মহাভারতাদি শাস্ত্রে এই দ্বিজত্ব গুণ-গত এবং জাতিগত উভয় প্রকারেই

প্রকাশিত হয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এইরূপই নির্দ্দেশ করেছেন; কারণ, পিতার গুণ সহজে পুত্রে সংক্রমিত হয়, এইজন্য গুণ ক্রমে জাতিগত হয়ে পড়ে কিন্তু বহু প্রাচীন কালে দ্বিজত্ব কেবল গুণগত ছিল বলে বোধ হয়। সত্যকাম জাবালির উপাখ্যান উহার প্রমাণ। সত্যকাম বেদপাঠের নিমিত্ত উপস্থিত হলে, তাঁর গুরু তাঁর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন, সত্যকাম পিতার নাম বলতে পারলেন না। তিনি মাতার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করাতে, মাতা বললেন, তিনি যৌবনে একে একে অনেককে পতিরূপে বরণ করেছিলেন; অতএব সত্য-কাম কার ঔরসজাত, তা তিনি জানেন না। সত্য-কাম গুরুকে এসে তাই বললেন! গুরু বললেন, ঘৃণিত ও নিন্দিত হবার সম্ভাবনা দেখেও আপনার ঐরূপ জন্মবৃত্তান্ত যে জিজ্ঞাসিত হয়ে সর্ব্বসমক্ষে এরূপ অকপটে বলতে পারে সে মহা সত্যনিষ্ঠ; এবং সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ, অতএব তোমাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখছি, তোমাকে আমি বেদপাঠ করাব। এই কথা বলে তাঁর উপবীত প্রদান করে বেদাভ্যাস করালেন। এই সত্যকামই পরে একজন প্রবীণ আচার্য্য হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিগত হয়ে পড়েছে। গুণ থাক্, আর নাই থাক্, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হবে, কিন্তু বৈদিক সময়ে গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বের নির্দ্দেশ হত। এই শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা আমরা বেদের অধিকারী বলে ব্রাহ্মণত্ব-গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থির করব। যাঁতে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, তিনিই বেদ-পাঠে অধিকারী। আবার বেদমধ্যে দেখা যায় যে, সকলকেই বেদোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ দিতে ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্র-মতে এই বেদ অনাদি, ইহা জ্ঞানরূপে ব্রহ্মের সহিত অনাদি-কাল স্থিত। যখন এই বেদোক্ত, বিশেষতঃ উপনিষদুক্ত জ্ঞান, কারও অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার আবিষ্কারক ঋষিমাত্র বলে বর্ণিত হন। সকল বেদ-মন্ত্রের ঋষি ও দেবতা আছেন। যে বিষয়ের জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাকে দেবতা বলা হয় এবং যাঁকে আশ্রয় করে ঐ জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাঁকে ঋষি বলে।

বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। দর্শনকার জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ড-মীমাংসায় বলেছেন, 'অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ এর পর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করতে হবে। কার পর? নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি করে তার পর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করবে। ইহাতেও

পরোপকার, সত্যবাদিতা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু, ইহাতে সত্যের জন্য সত্যকথন না হয়ে স্বর্গাদি বা অন্য কোন বাসনায় ঐ সকল কৃত হয়ে থাকে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সকল কার্য্যই সকাম। অতএব বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও জৈমিনি-প্রণীত পূর্ব্ব মীমাংসা পাঠ-কালে বর্ত্তমান শিক্ষানুযায়ী হয়ে কর্ম্ম কথাটি, যাহা কিছু করা যায় তাই কর্ম্ম (any thing done) —এইরূপ বুঝলে ভুল হবে। বেদের দ্বিতীয় বিভাগ, জ্ঞানকাণ্ড। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা স্থির করেছেন যে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞানের বাইরে এক অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, জ্ঞাতের বাইরে এক অজ্ঞাত দেশকালা-পরিচ্ছিন্ন পদার্থ আছে, কিন্তু ইহা আমাদের বুঝবার বা জানবার যো নেই। বেদান্তও বলেন, এই জ্ঞান আমাদের বাক্য-মনের অগোচর, কিন্তু ইহা অপরিজ্ঞেয় হলেও আমরা ইহা লাভ করতে পারি, ইহার সহিত একীভূত হতে পারি। ব্যাসসূত্র বা উত্তরমীমাংসায় জ্ঞান-কাণ্ডের বা উপনিষদের শ্লোক সকলের তাৎপর্য্য সূত্রা-কারে গ্রথিত হয়েছে এবং উপনিষদের মধ্যে যে, বিরুদ্ধ ভাব নেই ও সমগ্র উপনিষদ যে একই ভাব প্রকাশ করছে, ইহাই মীমাংসা করেছেন। জৈমিনি-দর্শনের ন্যায় উহাও 'অথাতো' বলে আরম্ভ

করেছেন। উহাতে প্রযুক্ত এই 'অথ' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এক মঙ্গল-বাচক শব্দ বলে কিংবা অনন্তর অর্থে। কার অনন্তর? কর্ম্মকাণ্ডের অনন্তর, হতে পারে না, কারণ কর্ম্ম হতে কখন জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না, কর্ম্ম কর্ম্মেরই উৎপাদক। অতএব আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ—সাধন-চতুষ্টয়ের অনন্তর বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই সাধন-চতুষ্টয় কি? প্রথম, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, জ্ঞান-বিচারদ্বারা কি নিত্য, কি অনিত্য, স্থির করতে হবে। অনেকে জ্ঞানকে অতি হেয় বলে গণ্য করে থাকেন। সত্য বটে, জ্ঞান-বিচার সেই নিত্য বস্তুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাতে পারে না, তা বলে ইহার যে কোন কার্য্যকারিতা নেই, তা বলা মহাভ্রম। এই জ্ঞান-বিচারদ্বারাই ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জেনেছেন, এক অজ্ঞেয় দেশকালাপরিচ্ছিন্ন বস্তু (Unknown) আছেন। তিনি নিশ্চিত আছেন একথাও ত তাঁরা ইহার সাহায্যে জানতে পেরেছেন। তিনি আছেন বলে যে নিশ্চয় বিশ্বাস করেছে তার তাঁকে প্রাপ্ত হতে আর অধিক বিলম্ব নেই। দ্বিতীয়, —ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, অর্থ—ইহলোকের সুখ, কি পরলোকে প্রাপ্য স্বর্গাদি-সুখ উভয়েতেই বৈরাগ্য-বান

হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়—শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ছয় পদার্থ। (১) শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, মনে কতরূপ কামনার উদয় হচ্ছে, কতরূপ চাঞ্চল্য আসছে, এই সমস্ত দমন করা। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান সাধন, যার উহা নেই, তার সমস্তশক্তি ব্যয় হয়ে যায়। মন অনন্ত শক্তির আধার, সংযমের দ্বারা এই শক্তি ক্রমে বিকাশিত হতে থাকে। আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে, এই শক্তি বিকাশিত করলে আমরা প্রায় সর্ব্বশক্তিমান হতে পারি। অবতারাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষেরা ইহাই দেখিয়ে গিয়েছেন যে, আমরাও ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে তাঁদিগের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তাঁদের ন্যায় শক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হতে পারি। যদি তাই না হয়, তবে অবতারের আসবার প্রয়োজন কি? অবতারাদি মহাপুরুষেরা আমাদের কি করতে হবে এবং কিরূপে করতে হবে ইহাই নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে যান। তাঁরা আমাদিকে এক নূতন আদর্শ দেখিয়ে যান, যাতে আমরা সকলে সেই আদর্শের অনুরূপ হতে পারি। অনেকে মনে করেন, বিবাহাদি হলে, গৃহস্থ হলে ইন্দ্রিয় সংযম করা অসম্ভব। ইহা অত্যন্ত ভুল। ইচ্ছা থাকলে গৃহস্থও

ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মনমুখ এক করলে সব হয়। মনমুখ এক কর দেখি, ইন্দ্রিয় সংযমাদি সকল বিষয় তোমার নিশ্চয়ই করায়ত্ত হবে। আমার একজন পাশ্চাত্য বন্ধু আছেন, তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি পূর্ব্বে কোনরূপ নূতন কল কারখানার উদ্ভাবনা করতে পারতেন না। যা পড়েছেন, তাই কার্য্যে পরিণত করতেন মাত্র। তিনি বিগত চার বৎসর স্ত্রীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেছেন এবং তার ফলে সম্প্রতি একজন বিখ্যাত যন্ত্রাবিষ্কারক হয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, এখন কোন বিষয়ের চিন্তা করতে গেলে, সেই বিষয়ের একখানি ছবি যেন তাঁর মনের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, তিনি তাতে সমস্তই দেখতে পান। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের এমনই ফল! ব্রহ্মচর্য্য না থাকার জন্যই আমাদের এত দুর্দ্দশা হয়েছে। (২) দম—বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, হস্তাদি ও চক্ষু প্রভৃতিকে মনের বশে আনয়ন করতে হবে। (৩) তিতিক্ষা, অর্থ—সহ্য করা। সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ, ইত্যাদি যার যে পরিমাণে সহ্য হয় সেই পরিমাণে সহ্য করা। (৪) উপরতি অর্থাৎ রূপরসাদি-বিশিষ্ট বাইরের বস্তু সকল হতে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে ভেতরে আনয়ন করা। (৫) শ্রদ্ধা অর্থ,—বেদশাস্ত্র ও গুরু-

বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। (৬) সমাধান—ঈশ্বর-বিষয়ে মনের একাগ্রতা। চতুর্থ—মুমুক্ষুতা।—এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হলে জ্ঞান-কাণ্ডে অধিকার জন্মে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলেছি, কর্ম্ম-কাণ্ডেও পরোপকার সত্য-কথন প্রভৃতির অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, বেদের কর্ম্ম-কাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম, মন্ত্রভাগ—ইহাতে ইন্দ্রাদি নানা দেবতা-সম্বন্ধে স্তবাদি আছে এবং দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণভাগে যাগযজ্ঞাদি করবার নিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে।

দশম অধ্যায়

সৃষ্টি-রহস্য

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, রবিবার ২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৮)

সৃষ্টির অনাদিত্ব

আজ ছান্দোগ্য উপনিষদ হতে একটি গল্প পাঠ করব,—শ্বেতকেতু নামে একটি ব্রাহ্মণপুত্র ছিলেন; তাঁর পিতার নাম আরুণি বলে তাঁকে আরুণি শ্বেতকেতু বলত। একদিন তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, "শ্বেতকেতো, তুমি ব্রহ্মচর্য্য আচরণপূর্ব্বক গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন কর।" শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। শাস্ত্রাদি পাঠ করে নিজের পাণ্ডিত্য চিন্তা করতঃ কিছু অহঙ্কারী হয়েছেন দেখে, তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, "শ্বেতকেতো, তুমি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ সত্য, কিন্তু এরূপ কিছু জেনেছ, যা জানলে জগতের সমস্ত পদার্থই জানা যায়?

মাটিকে জানলে যেরূপ মাটির বিকার সরা খুরি প্রভৃতি সমস্তই জানতে পারা যায়, সেইরূপ এমন এক বস্তু আছে, যাকে জানলে জগতে জানিবার আর কিছু বাকি থাকে না। এরূপ কোন বস্তু কি জানতে পেরেছ?" শ্বেতকেতু বললেন, "না, আমি এরূপ বস্তু জানি না, আমার গুরুও ইহা জানেন না, জানলে অবশ্যই সে বস্তুর কথা আমাকে বলতেন। অতএব আপনি যদি তা জানেন, অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন।" আরুণি বললেন, "শ্বেতকেতো! অগ্রে কেবল এক সৎ বস্তুই বিদ্যমান ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমস্ত সৃষ্টি করেছেন; তিনি ঈক্ষণ করলেন—ইচ্ছা করলেন—আমি বহু হব এবং তিনি বহু হলেন।" এইরূপে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করে শিক্ষা দিলেন। এক্ষণে আমাদের বুঝা আবশ্যক, এই যে সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণনায় বলা হয়েছে, অগ্রে কিছুই ছিল না, কেবল এক সৎ ছিলেন, এর অর্থ কি? সৃষ্টি আদৌ ছিল না, বা হয় নাই এরই কি অর্থ? না, আমাদের শাস্ত্রের কোথাও এরূপ উল্লেখ নেই। এর অর্থ—সৃষ্টি বীজরূপে সেই সৎবস্তুতে বর্ত্তমান ছিল, সৃষ্টি সেই সৎবস্তু হতে পৃথক্ নয়, তিনিই বহু হয়েছেন। যখন এই সৃষ্টি তাঁর অংশ হল,

তখন ইহা ছিল না, এরূপ কিরূপে হবে? প্রকাশভাবে সৃষ্টি না থাকুক, বীজভাবে ছিল। বৃক্ষ যেমন বীজ হতে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে শাখা-পত্রাদির আকারে প্রকাশিত হয় ও পরে আবার বীজে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়, সেইরূপে সৃষ্টি বারংবার প্রকাশিত ও লয় হয়ে থাকে, ব্যক্তাবস্থা হতে আবার অব্যক্ত অবস্থায় লুক্কায়িত হয়। এইরূপে প্রকাশ ও প্রলয় এই দুই অবস্থায় প্রবাহরূপে সৃষ্টি অনাদিকাল বর্ত্তমান আছে। সৎবস্তু যেরূপ অনাদি, এই সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি। সৃষ্টির আদি আছে বললে দুটি দোষ উপস্থিত হয়, ইহা আমরা গত বারে দেখেছি—প্রথম বৈষম্যদোষ—আমরা জগতে বৈষম্য দেখতে পাই—কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থকায়; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ ইত্যাদি; এইরূপ বৈষম্য কেন ও কোথা হতেই বা হয়? সৃষ্টিকর্ত্তা-কৃত বললে তাঁতে পক্ষপাতিত্ব দোষ পড়ে এবং দ্বিতীয়, তাঁতে নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়, তাঁর নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ হয়, কারণ অকারণে তিনি কাকেও সুখী এবং কাকেও মহাদুঃখী করছেন। বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলে বর্ণিত। উহা প্রবাহ রূপে অনাদি, উহা তাঁরই

াপ, তাঁরই অংশ, তিনিই। সৃষ্টির আদি আছে ললে আর এক দোষ উপস্থিত হয়, উহা এই—খন সৃষ্টি ছিল না তখন ভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব না াকার জন্য তাঁর পূর্ণত্ব ছিল না—তিনি অপূর্ণ ছলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ে তাঁর অধিক গুণপ্রাপ্তি য়েছে অথবা গুণের হ্রাস হয়েছে, বলতে হয়। এজন্য কি বেদ, কি পুরাণ, কি মহাভারত, কি ম্মৃতি—সকল শাস্ত্রেই সৃষ্টি অনাদি বলে কথিত হয়েছে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়া—প্রাণ ও আকাশ

মহাভারতাদিতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করে সাধারণতঃ আমরা অনেক ভুল বুঝে থাকি। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ, প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হল, এখন প্রাণ মানে আমরা নানারূপ বুঝে থাকি। কেহ নিঃশ্বাস অর্থ বুঝে লন, কেহ জীবাত্মা বুঝেন ইত্যাদি, কিন্তু এরূপ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নি। সেইরূপ আকাশ অর্থে আমরা অবকাশ বুঝি, এই আকাশের তিন রূপ অর্থ আছে। প্রথম মহাকাশ—বাহ্য জগতের সকল বস্তু এই মহাকাশে বর্ত্তমান। সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, চন্দ্র,

সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, বৃক্ষাদি সমস্তই এই অবকাশে রয়েছে; দ্বিতীয়, চিত্তাকাশ আমরা যে সমস্ত চিন্তা করি, বিচার করি বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্ত্তমান রয়েছে। এই জন্য মনকে আকাশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তৃতীয়—চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানময় আকাশ; আমাদের যে জ্ঞান, তাহা সামান্য জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ পূর্ণজ্ঞানের আকাশ। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানে জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নেই—পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ; এই আকাশে বাহ্যিক মহাকাশ ও আন্তরিক চিত্তাকাশ উভয়ই রয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় আকাশ আর এক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। ইহা পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ, ইংরাজীতে যাকে matter বলে; ইহা জড়ের সূক্ষ্ম অংশ, এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু শক্তি, যেমন গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অন্ন পরিপাক শক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্তই সেই এক প্রাণেরই বিকার, সেইরূপ আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস-শক্তিও সেই প্রাণের বিকার এবং এই নিশ্বাস শক্তি বর্ত্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলে একে বিশেষরূপে প্রাণ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু

াস্ত্রের সৃষ্টি বর্ণনস্থলে 'প্রাণ' বলতে এক মূল
ক্তিকে বুঝতে হবে, অন্য সকল শক্তিই যার
াকারপ্রসূত ; এবং 'আকাশ' বলতে বুঝতে
বে, মূল জড় বস্তু—আর সমস্ত জড় বস্তুই যার
কার মাত্র।

সৃষ্টি প্রক্রিয়া—শাস্ত্র ও বিজ্ঞান

শাস্ত্রের সৃষ্টিবিষয়ক মত আমরা না বুঝেই অনেক
ময় ভ্রান্ত বলে অগ্রাহ্য করি, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান,
াস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনেক স্থলে সত্য বলে প্রমাণ
রে দেয়। শাস্ত্র বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে পূর্ব্বোক্ত
াকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য্যে হতে
ারম্ভ হয়। ইহার প্রথম ফল বায়ু বা কম্পন।
র্থাৎ আকাশের পরমাণু সকলের কম্পন আরম্ভ হয়।
ায়ু—বা ধাতু—কম্পন অর্থ। আকাশ হতে এই
ায়ুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হতে
তেজঃ জন্মায়। বিজ্ঞানও আজ কাল ইহা প্রমাণ
রছে। কোন বস্তুর গতিরোধ করলে তা উত্তপ্ত
য়ে উঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বইলে উত্তাপ
ৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ও
ামাদের পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্তাবস্থায় ছিল,

ক্রমে শীতল হয়ে বাসোপযোগী হয়েছে। এখনো সূর্য্যলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্তু বাষ্পরূপে বর্ত্তমান রয়েছে। এই তেজঃ শীতল হয়ে অপ্ বা জল হয় ও ক্রমে কঠিন হয়ে পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকাদিরূপে পরিণত হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পঞ্চমহাভূত পূর্ব্বোক্তাদিরূপে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই স্থূল জগৎ নির্ম্মিত হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বে—সাংখ্য ও বেদান্ত

বেদান্ত মতে এই স্থূল জগৎ এক সত্যেই রূপান্তর মাত্র। ঐক সৎবস্তুকেই অবলম্বন করে এই জগৎ রয়েছে; তিনিই এই জগৎ হয়েছেন। সাধারণতঃ বেদান্তের অর্থ লোকে এইরূপ করে যে, জগৎ মিথ্যা, জগৎ নেই; কিন্তু বেদান্তের এরূপ অর্থ নয়। যখন সৎবস্তু হতে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তখন ইহা একেবারে মিথ্যা কি করে বলব? যখন তিনিই সকল জীব জন্তুর প্রাণরূপে বর্ত্তমান রয়েছেন, তখন ইহা কিরূপে মিথ্যা হতে পারে? আমাদের এইস্থলে "মিথ্যা" এই কথা "কম সত্য, সেই পূর্ণ সত্য অপেক্ষা কম সত্য" এরূপ বুঝলে আর কোন গোল হবার সম্ভাবনা নেই।

াংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব এরূপ—পুরুষ ও প্রকৃতি দুই অনাদি স্তু। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হন, ারূপ চুম্বক লোহের সান্নিধ্য বশতঃ লোহ আকৃষ্ট হয়। এই াকৃতি হতে মহান্ অর্থাৎ বুদ্ধি, বুদ্ধি হতে অহংজ্ঞান, হঙ্কার হতে পঞ্চসূক্ষ্মভূত ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়।

সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভেদ—ঈশ্বর তত্ত্বে

এখন সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে প্রভেদ এই, াংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না, বেদান্ত করেন। বদান্ত বলেন, যেমন মানুষের এই দেহ, সেইরূপ সমগ্র ষ্ট জগৎ একটি মহান্ বিরাট দেহ। আমাদের দেহ কল সেই সমষ্টি দেহের অংশ মাত্র। প্রত্যেকের যরূপ মন আছে, সেইরূপ এই স্থূল জগতের ভেতর াক অনন্ত মন আছে, আমাদের প্রত্যেকের মন সেই হান্ মনের অংশমাত্র। সমস্ত দেহ পরস্পর সম্বদ্ধ; ারণ তারা এক বিরাট দেহের অংশ। সমস্ত মন ারস্পর সম্বদ্ধ; কারণ তারা এক বিরাট মনের অংশ।

বৈদান্তিক ঈশ্বর বাদের কার্য্যকারিতা নিঃস্বার্থপরতা

যখন একটি দেহ ক্লেশ পায় বা একটি মনে দুঃখ

উপস্থিত হয়, তখন আর আর দেহ ও মনেও সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত হবে। কারণ, তাহারা পরস্পর সংলগ্ন ও সেই একেরই অংশ হয়ে রয়েছে। অতএব তোমার মঙ্গলে আমারও মঙ্গল ও তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল। তোমার উন্নতি ও অবনতি তোমাতেই অবসিত হচ্ছে না, তার প্রতিঘাত আমাতে ও সর্ব্ব জগতে গিয়ে লাগছে। সেইরূপ এক জাতির উন্নতি অবনতি অপর জাতি সমূহকে স্পর্শ করে। আমরা বেদান্তের এই মহান্ সত্য যে দিন হতে ভুলেছি, সেই দিন হতেই আমাদের অবনতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্বার্থের বশীভূত হয়ে আমরা যে স্ত্রী ও শূদ্রজাতির প্রতি অত্যাচার করেছি, এখন তারই ফলভোগ করছি। সমাজশরীরের এক অংশ রোগ-গ্রস্ত হলে অপর অংশও রুগ্ন হয়—পাশ্চাত্যগণ বেদান্ত না পড়েও বহুদর্শিতায় ইহা বুঝেছে ও এখন সেই সত্যটি কার্য্যে পরিণত করতে চেষ্টা পাচ্ছে; এক-দেশে মহামারী হলে অপর দেশে হবার সম্ভাবনা, অতএব পরের দেশের মহামারী নিবারণের চেষ্টা করছে; স্ত্রীজাতির অবনতিতে সমাজের অপর অঙ্গ পুরুষজাতিরও অবনতি হয়ে থাকে এবং অপর দেশের অমঙ্গলে নিজেদেরও অমঙ্গল, ইহা বুঝেছে। জগতস্থ সকল

ব্যক্তি ও বস্তুই সেই বিরাট মূর্ত্তির অঙ্গ, এই মহান্ ভাব বেদান্ত প্রচার করছেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, "হে অর্জ্জুন! যা কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখবে, তা আমি; নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ" ইত্যাদি বলে অবশেষে বলছেন, "ঐরূপে এক একটি আমার বিভূতির কথা আর আমি কত বলব, আমিই একাংশে সমস্ত জগৎ হয়ে রয়েছি।" এই বিরাটের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। 'সাধন-ভজন' শব্দের অর্থ এক কথায় বলতে হলে, বলতে হয় যে উহা, সম্পূর্ণ স্বার্থ-ত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থ-ত্যাগ ভিন্ন কোন পথে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা নেই। আপনাকে ভুলে যাওয়া—যে আপনাকে ভুলতে পেরেছে, স্বার্থত্যাগ করতে পেরেছ, তার সাধন ভজন সব হয়েছে। ঈশ্বর কি খোসামোদের বশ যে, যে তাঁকে স্তব স্তুতি করল, তার প্রতি প্রসন্ন হবেন, আর যে করল না, তার প্রতি বিমুখ হবেন? না, তিনি এরূপ নন। একজন ভগবান মানে না কিন্তু সে স্বার্থশূন্য, পরের সেবা তার ব্রত, জেনো, তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নাই। আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপূজায় ব্যস্ত কিন্তু মহাস্বার্থপর, তার সাধন ভজন পণ্ডশ্রম মাত্র।

সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখতে হবে, সকলকেই তাঁর মূর্ত্তি জেনে সেবা করতে হবে। বেদান্ত ইহাই বলেন, আমরা সকলেই বিরাটের অংশ। সেই বিরাট মনের এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে আমি বলছি, আমার মন!—তুমি একটু নিয়ে বলছে, তোমার মন। যেমন গঙ্গার স্থানে স্থানে বেড়া দিয়ে আমরা এক একটা নাম দিচ্ছি—ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গা ইত্যাদি। সকলেই জানেন কিন্তু গঙ্গা বাস্তবিক এক!—এক জল, এক তরঙ্গ কেবল নামরূপে আমরা প্রভেদ করছি মাত্র। সমুদ্রের একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলছি? যখন দুজনের মন পরস্পরের প্রতি স্বার্থশূন্য ভালবাসায় সংযুক্ত হয়, তখন ঐ দু জন একভাবে ভাবিত হয়, তখন তাদের শরীর পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকলেও মনের কথা জানতে পারে; আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এইরূপে আমাদের মন ও শরীর যে পরস্পর সংলগ্ন রয়েছে ইহা এক মহাসত্য। অতএব একথাও সত্য যে যখন আমাদের মনে পাপ চিন্তা উদয় হয়, তখন অন্যান্য মনের পাপ-চিন্তা সকলও প্রবাহিত হয়ে উহাকে আরও পাপে

নিমগ্ন করে। আবার কোন সৎ বা ধর্ম্ম চিন্তা উদয় হলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা আমাদের মনের উপর কার্য্য করে উহাকে আরও উন্নত করতে থাকে। এইরূপে আমাদের সমস্ত সাধন ভজন আমাদের স্বার্থশূন্য করে বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে।

ঈশ্বরের প্রকাশ ব্যক্তিভেদে

যার যেরূপ মন, সে বিরাটকে সেইরূপে ভেবে থাকে ; যে নিষ্ঠুরস্বভাব ভগবানকে সে নিষ্ঠুরস্বভাব-বিশিষ্ট দেখে, যে পুণ্যবান, সে ভগবানকে অনন্ত পুণ্যময় দেখতে পায়। এইরূপে আমাদের নিজের স্বভাব অনুযায়ী আমরা ভগবান কল্পনা করি। ইহা স্বাভাবিক এবং ইহা সত্য, কারণ মনের উন্নতি অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকে ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণা করি, ঐ ধারণাই সেই সময়ে ভগবানের স্বরূপ বলে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ঐসকল ধারণা আবার, একভাবে সত্য এবং অন্য ভাবে মিথ্যা বলে বুঝতে পারা যায়। যেমন সূর্য্যকে আমরা পৃথিবী হতে যেরূপ দেখি তা সূর্য্যের প্রকৃতরূপ নহে, কিন্তু আমরা যা দেখি তাও মিথ্যা নয়। সূর্য্যের

দিকে যতই অগ্রসর হব, সূর্য্যকে আমরা ততই ভিন্নরূপে অবলোকন করতে থাকব এবং ঐরূপে সূর্য্যলোকে যদি কখন উপস্থিত হতে পারি, তখন সূর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নয়নগোচর হবে। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ;— দূর হতে পর্ব্বত দেখলে বোধ হয়, একখানি কাল মেঘ উঠেছে; যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ঐ পর্ব্বতস্থ বৃক্ষমন্দিরাদি দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমে আরও অগ্রসর হলে জীব জন্তু প্রভৃতি দেখা যায়। ঐরূপ যতই সেই বিরাট পুরুষের নিকটে যাওয়া যায়, ততই আমরা তাঁর নূতন নূতন ভাব সকল দেখতে ও বুঝতে থাকি এবং ক্রমে পূর্ণজ্ঞানে তাঁর সহিত সম্মিলিত হয়ে যাই। পরমহংসদেব ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেন—"যেমন ঘরের ভেতর একটু আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আস্‌ছে। যে ভেতরে আছে তার আলো জ্ঞান সেই টুকু; যার ঘরে অনেক ছিদ্র, সে অধিক আলো দেখতে পায়; দরজা জানলা কর ত আরও আলো হয়; আবার ঘর ছেড়ে মাঠে গিয়ে যে বসেছে তার কাছে আলোয় আলো। ভগবান্ এইরূপে লোকের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

বেদান্ত কি নাস্তিক

লোকে ভুল বুঝে বেদান্ত শাস্ত্রকে নাস্তিক শাস্ত্র

বলে। যে বেদান্ত সকলেরই ভেতর অনন্তকে দেখিয়ে দেয়, সকলকেই ব্রহ্মের অংশ বলে পূজা করতে বলে, তা কখন কি নাস্তিক শাস্ত্র হতে পারে? আমরা অতি হীন হয়েছি, নিজেরা শাস্ত্র পড়ি না, বুঝি না, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। আবার শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝতে হবে। সকলের ভিতর আনন্দময় ব্রহ্মকে দেখতে হবে, সমস্ত জগতে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই উন্নতির সময় আসবে।

একাদশ অধ্যায়

সাধন-নিষ্ঠা

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

গীতায় ভগবান্ বলছেন, "ঈশ্বরোপাসনা করতে অগ্রসর হয়ে ইহলোকে মানবের নিষ্ঠা দ্বিবিধ হতে দেখা যায়। প্রথম জ্ঞাননিষ্ঠা, দ্বিতীয় কর্ম্মনিষ্ঠা। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করলে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞান-প্রাপ্ত না হলেও কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্ম্মত্যাগ করে ক্ষণমাত্র বাঁচবার উপায় নেই। ইচ্ছা না থাকলেও প্রাকৃতিক গুণ মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। তুমি নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর—কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকর্ম্ম শূন্য হলে তোমার শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হবে না" ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে দেখেছি বেদের প্রতিজ্ঞা কি। বেদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কি তাই শিক্ষা দেন। আত্মজ্ঞান কাকে বলে, এবং কি উপায়েই বা উহা লাভ হতে পারে, বেদ সেই বিষয়েই সকলকে বলে

থাকেন। বেদ বলেন, সকলের ভেতরেই পরমাত্মা রয়েছেন। জীবজন্তু কীটপতঙ্গের ভেতর তিনি, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের ভেতরও তিনি। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যের ভেতরে ও বাইরে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রয়েছেন।

তাঁকে কে লাভ করতে পারে? যার দৃঢ়তা আছে, যে সাহসী, সেই তাঁকে লাভ করতে সক্ষম। যে দুর্ব্বল-দেহ, যার মন নিস্তেজ, আত্মজ্ঞান তার পক্ষে লাভ হওয়া কঠিন। তেজীয়ান হতে হবে; তা হলেই ভগবান্‌কে লাভ করতে পারা যাবে। বেদ বিশেষ করে সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ই বলেন। সনাতন ধর্ম্মের অর্থ এই :—যে ধর্ম্ম, কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেরই নিত্য সম-ভাবে অনুষ্ঠেয়; যা সকল সময়ে এক এবং অপরিবর্ত্তনীয় রূপে বিদ্যমান। আর স্মৃতি, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণাদি দেশকাল ও পাত্রভেদে যুগধর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করেন। দেশকাল পাত্র বিবেচনায় নানাপ্রকার যুগধর্ম্ম কালে কালে জগতে প্রচলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কি হওয়া উচিত তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন। উহা সংক্ষেপে এইরূপে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে—নিজ ধর্ম্মমতে নিষ্ঠা রাখবে

কিন্তু অপরের ধর্ম্মকেও ভালবাসবে, ঘৃণা করবে না। উহা তিনি যে, শুধু বলে গিয়েছেন, তা নয়, কিন্তু নিজ জীবনে উহার অনুষ্ঠান করে আমাদের দেখিয়েও গিয়েছেন। তিনি সাধন দ্বারা উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন—"যত মত, তত পথ।" সকল ধর্ম্মই সত্য; যে যেরূপ অধিকারী, সে আপনার অনুরূপ পথ বেছে নেয়।

শাস্ত্রে বলে, সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির আদি স্বীকার করলে ভগবানে অপূর্ণতা দোষ হয়। যদি বলা যায়, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে পূর্ণ ছিলেন, তবে সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণতর হলেন, বলতে হয়। আর যদি বলা যায়, সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণ হলেন, তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, বলতে হয়। এ উভয় পক্ষেই দোষ রয়েছে। 'পূর্ণতর' কথাটি স্ববিরোধী; কারণ যা পূর্ণ হতে পূর্ণতর হল, তা বাস্তবিক অপূর্ণই ছিল, বলতে হয়। পূর্ণের আবার নবীন বিকাশ কি? সৃষ্টির আদি স্বীকার করলে আবার, তাঁকে নিষ্ঠুরতা দোষে দোষী করা হয়। দেখা যায়, জগতে কেহ বা দরিদ্র, রুগ্ন ও মূর্খ; কেহ বা ধনী, সুস্থকায় ও বিদ্বান। ভগবান্ যদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে এইরূপ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন করে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তাতে পক্ষপাতিতা ও

নিষ্ঠুরতা দোষ অনিবার্য্য রূপে এসে পড়ে। এই হেতু শাস্ত্র বলেন, সৃষ্টি অনাদি।

যখন ইহা সূক্ষ্মভাবে বীজরূপে থাকে, তখন ইহার প্রলয়াবস্থা, যখন স্থূলভাবে প্রকাশ, তখন সৃষ্টি। এক সৃষ্টি ও এক প্রলয় নিয়ে এক কল্প হয়। এইরূপে সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে অনাদিকাল বর্ত্তমান। ইহা ভগবান ছাড়া অন্য কিছু নয়; তিনিই ইহা হয়েছন। শাস্ত্র বলেন, তিনি ঈক্ষণ করলেন, (আলোচনা করলেন) যে, আমি প্রজারূপে বহু হব এবং তৎক্ষণাৎ এই সৃষ্টি-রূপে প্রকাশিত ও বহু হলেন। সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না; কারণ, তিনি পূর্ণ। কার্য্যের উদ্দেশ্য কার থাকে? যার কোনরূপ অভাব আছে। সেই অভাবমোচনের জন্য সে নানাভাবে কার্য্য করে এবং নানাবিষয়ের সাহায্য নেয়। ভগবানের কোন অভাব নেই। তাঁর কিছু পাবার আবশ্যক নেই, কারণ, তিনি পূর্ণ। অতএব তাঁর এই সৃষ্টি করবার কোন উদ্দেশ্যও নেই। পাশ্চাত্যেরা একথা বুঝতে পারে না। সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নেই বললে তারা ভেবে বসে, তবে বুঝি সৃষ্টিতে কোন নিয়ম বন্ধন নেই, এটা একটা পাগলামি মাত্র। উদ্দেশ্যহীন কোন কার্য্য যে হতে পারে, ইহা তারা মনে করতে পারে না।

কারণ, তারা নিজেদের এবং অপর সাধারণের অপূর্ণত্ব দেখে স্থির নিশ্চয় করে, উদ্দেশ্যহীন কার্য্য সাধারণ মানুষের দ্বারা কোন কালে হয় না; দেখে, তাদের অভাব আছে বলেই তারা কার্য্য করে; সুতরাং অনুমান করে, সৃষ্টিকার্য্যও এইরূপ হয়েছে। ভগবান কোন এক মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়েই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনুধাবন করে দেখলে এই যুক্তি ভ্রমপূর্ণ বলে বোধ হয়। কারণ, এতে ভগবান মনুষ্য-তুল্য, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য নেই, ইহা তাঁর খেলা, ইহা তাঁর লীলামাত্র। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন হলে কখন কি কার্য্য হতে পারে? শাস্ত্র-কারেরা বলেন, অবশ্য হতে পারে। দৃষ্টান্ত দেন যেমন বালকের কার্য্য; বালক পথে যেতে যেতে পতঙ্গ দেখে তাই ধরতে যায়, উদ্দেশ্যহীন নানাকার্য্য করে, ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যও তদ্রূপ। সৃষ্টিতে তিনিই নানারূপে এই প্রকারে সেজেছেন—ইহা তাঁহার খেলা বা লীলা মাত্র।

দেখতে পাই, সংসারে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত। এই বৈষম্যের কারণ কি? শাস্ত্র বলেন, ইহার কারণ কর্ম্ম। "কর্ম্ম'

ব শাস্ত্রে অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাস্ত্র
লেন, পৃথিবী নক্ষত্রাদিও কর্ম্মসম্ভূত। একথার অর্থ কি?
খানে কর্ম্মের অর্থের কারণ বা বীজভাব হতে কার্য্য বা
কাশিত অবস্থায় পরিণত হওয়া, ঐরূপ পরিণতিকেই
র্ম্ম বলে। সৃষ্টি যখন অনাদি হল, তখন সৃষ্টিবৈষম্যের
ারণ 'কর্ম্ম' ও যে অনাদি, ইহা আর বলা বাহুল্য।

কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। যে কর্ম্ম কর না কেন,
াহার ফল ভোগ করতে হবেই হবে। কেউই এর
ন্যথা করতে পারে না। চিন্তার উদয়রূপ মানসিক
র্ম্মেরও ফল আছে। কোন পাপচিন্তা উদয় হলে তৎ-
ণাৎ তার ফলস্বরূপ মন কলুষিত হয় এবং যখন ঐ
াপচিন্তা প্রবল হয়, তখন উহা শারীরিক কার্য্যরূপে
াহিরে প্রকাশিত হয়। আমরা অনেক সময় কর্ম্মের
ল দেখতে না পেলেও কোন না কোনরূপে তা
র্ত্তমান থাকে ইহা নিশ্চিত। শরীরসম্বন্ধীয় অনিয়ম
াগরূপে আমাদের কষ্ট দেয়। রোগ ঔষধ দিয়ে উপশম
য়। ইহাতে শারীরিক অনিয়মের ফল, ঔষধসেবনরূপ
ন্য এক কর্ম্মফল দ্বারা রূপান্তর ধারণ করল মাত্র।
টি ভিন্ন কর্ম্মের ফলই আমাদের উপভোগ করতে
ল। কোনটির বিনাশ হল না, উভয় কর্ম্মফল মিলে
কটি কর্ম্মফলরূপে প্রতীয়মান হল, এইমাত্র প্রভেদ।

যেরূপ নৌকার মাস্তুলে দড়ি বেঁধে উভয় তীর হতে গুণ টান্‌লে নৌকা কোন তীরে না গিয়ে নদীর মধ্য দিয়ে যেতে থাকে, সেইরূপ দুই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের সংযোগে এক বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, এই মাত্র। কিন্তু কর্ম্মফলের নাশ কখনও নেই।

অনেকের বিশ্বাস, কোন এক অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করলেই আমাদের সমুদয় পাপ মোচন হয়ে যায়। বেদান্ত বলেন, তাহা নয়। স্বয়ং হরি, হর বা ব্রহ্মা তোমার উপদেষ্টা হলেও তোমার মোক্ষ তোমার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করছে। * তবে অবতারাদি কি করেন? তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মপরিণত জীবন আমাদের সম্মুখে ধরে আমাদের কি করতে হবে, তাই দেখান। আমাদের সম্মুখে একটি আদর্শ জীবন রেখে দেন, যা দেখে আমরা তদনুরূপ হতে পারি। তাঁরা আদর্শ দেখে যান এবং উহা মনুষ্যজীবনে পরিণত করবার সহজ উপায়ও বলে যান, যার প্রভাবে লক্ষ জন্মের কার্য্য শত জন্মে, এমন কি, এক জন্মে শেষ করতে সমর্থ হয়ে মানুষ ধর্ম্মের চরম সীমায় উপনীত হয়। অতএব শাস্ত্র বলেন, কর্ম্ম ও

* হরিস্তে উপদেষ্টারঃ হরঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে॥

ার ফল নিত্যসম্বন্ধ—কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। ালয়কালে ইহা বীজভাবে ও সৃষ্টিকালে বিকাশভাবে াকে ; এই মাত্র প্রভেদ।

. সচরাচর চার প্রকৃতির মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। চউ জ্ঞানপ্রধান প্রকৃতির লোক। এঁরা বিচার ভিন্ন ান তত্ত্বই গ্রহণ করতে চান না। লোকের কথার পর বিশ্বাস করে কোন কার্য্য করতে চান না। দ্বিতীয়, ক্তিপ্রধান প্রকৃতির লোক। এঁরা কারও উপর অটল শ্বাস স্থাপন করে তদবলম্বনে অল্পস্বল্প বিচার করে কেন। তৃতীয়, কর্ম্মপ্রধান প্রকৃতির লোক—এঁরা পরো- কারাদি ধর্ম্মই একমাত্র কর্ত্তব্যবোধে সর্ব্বদা কর্ম্মেরই নুষ্ঠান করে থাকেন। চতুর্থ, যোগপ্রধান প্রকৃতির াক। এঁরা মানসিক শক্তিসমূহের তন্ন তন্ন বিচার ্র উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন। মানুষ এই রটি ভাবের কোন একটি মাত্র লয়ে অবস্থান করে, রূপ বলা ভ্রম। তবে উহার মধ্যে একটি ভাব প্রত্যে- র মনে অধিক প্রবল থাকে, এই মাত্র। যার যে ব প্রবল থাকুক না কেন, এবং যে, যে পথ অবলম্বন র চলুক না কেন, উন্নতির চরম সীমায় সকলেই াবানের সহিত একতা উপলব্ধি করে থাকে এবং শাস্ত্র একতা উপলব্ধির চারটি বিশেষ পথ উপদেশ করে

থাকেন। উহাদের নাম জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযো
ও রাজযোগ। ভগবানের সহিত আমাদের যুক্ত করে
বলেই এই চার মার্গ 'যোগ' শব্দে অভিহিত হয়
তন্মধ্যে সংক্ষেপে কর্ম্মযোগের বিষয় বল্‌ছি। অহংভাব
পরিত্যাগ করে বাসনাশূন্য হয়ে ভগবানের জন্য কর্ম
করার নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। আহার বিহার প্রভৃতি যে কোন
কর্ম্ম করবে, ভগবানের জন্য করছি, এই ভাব মনে
করবে। আমি কিম্বা আমার জন্য ইহা করছি, ইহা
না ভেবে ভগবানের জন্য করছি, এই ভাববে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কর্ম্মের দ্বিবিধ রূপ

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

শাস্ত্রে কর্ম্মশব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণতঃ, মানুষ যা কিছু করে, তাকেই কর্ম্ম বলা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র যেখানে বলছেন, কর্ম্ম হতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে—কর্ম্ম হতে সূর্য্য চন্দ্র হয়েছে, সেখানে কর্ম্মশব্দ, যে অচিন্তনীয় কার্য্যকারণ প্রবাহ সমগ্র জগৎকে বীজাবস্থা হতে বিশিষ্ট নামরূপদ্বারা প্রকাশিত করছে, সেই কার্য্যকারণ প্রবাহকে লক্ষ্য করে ব্যবহৃত হয়েছে। অদৃষ্ট অবস্থা হতে বস্তুর দৃষ্ট অবস্থান্তরে পরিণমনকেই কর্ম্ম বলা হয়েছে, অতএব পরিবর্ত্তন ও পরিণমন শক্তিই কর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। গীতা সেইজন্যই বলেন। "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"—অর্থাৎ যে ত্যাগ বা বর্জ্জনের দ্বারা ভূতান্তরের উৎপত্তি হয়—তাহাই কর্ম্ম।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। শাস্ত্র কোন

কর্ম্মকেই মিথ্যা বলেন নি। অনেকে বলেন, 'সংসারে থেকে ভগবান্ পাওয়া যায় না। সংসারে মানুষ যা কিছু কর্ম্ম করছে, সব মিথ্যা। তাদিয়ে কখনও ভগবদ্দর্শন হতে পারে না। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।' কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শাস্ত্র অবস্থাবিশেষে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেছেন মাত্র। সংসারকে ছোট, সন্ন্যাসকে বড় করেন নি। অবস্থা-বিশেষে সংসার কারও পক্ষে ঠিক আবার সন্ন্যাস কারও পক্ষে ঠিক, এই কথা বলেছেন। সকল কর্ম্মই আমাদিগকে ভগবানের দিকে লয়ে যাচ্ছে। কোন কর্ম্মই মিথ্যা নয়। যাহা অত্যন্ত স্বার্থপর কর্ম্ম, তাহা করঁতে করতেও লোকে নানারূপে ভুগে বহু-দর্শিতা লাভ করে ও ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়। ঐ নিষ্কাম ভাব আবার কালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে স্বভাবতঃ সন্ন্যাস এসে উপস্থিত হয়। ইহাই যথার্থ সন্ন্যাস। ইহা ভোগ ও ত্যাগ, এই দুই লক্ষণের অধিকার-ভুক্ত নয়। ইহা ঐ দুয়ের বাইরে। প্রথম হতে একে-বারে কর্ম্মত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে মানুষ অগ্রসর হতেই পারবে না। পরমহংসদেব এজন্যই বলতেন, "চর্ম্মরোগ আরোগ্য হলে শুষ্ক চর্ম্ম শরীর হতে আপনিই খসে পড়ে। কিন্তু আরোগ্য লাভ

হবার পূর্ব্বেই ঐ চর্ম্ম উঠাতে প্রয়াস পেলে যন্ত্রণা, রক্তপাত ও ক্ষতবৃদ্ধিই হয়ে থাকে।"

তিনি ঐ কথা আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতেন, "সংসার, সন্ন্যাস, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকলই মনুষ্যের উন্নতির মাত্রায় আপনা আপনি এসে উপস্থিত হয়, সেইজন্য যার যেরূপ শরীর ও মনের অবস্থা, তার পক্ষে সেইরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে ছেলের যেরূপ স্বাস্থ্য, তা বুঝে মা তার জন্য উপযোগী পথ্য ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। কোন কর্ম্মই ধর্ম্ম ছাড়া নয়, তবে যার যেরূপ অধিকার, তার পক্ষে সেইরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। একরূপ ধর্ম্মাচরণ সকলের পক্ষে উপযোগী হতে পারে না।"

শাস্ত্রে দুটি মার্গের বর্ণনা আছে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। যার সুখভোগের ইচ্ছা প্রবল, সে ধর্ম্মানুষ্ঠান করতে গেলে স্বভাবতঃ যাগযজ্ঞাদিলক্ষণ সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে। সুখাদি ভোগের পর, কালে যখন সে দেখবে তার প্রাণ অন্য কিছু উচ্চ বস্তু চাইছে, তখন সে আপনিই উহা ছেড়ে নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করবে। রাজা যযাতি পুরুর নিকট হতে তার যৌবন গ্রহণ করে সহস্র বৎসর ভোগ করতঃ যখন আবার তাকে ঐ যৌবন ফিরিয়ে দিলেন, তখন বললেন, "কাম্যবস্তু

সকলের উপভোগে কামনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দানের ন্যায় উহা বৃদ্ধিই পেতে থাকে।" যযাতির এই জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহস্র বৎসর বিষয়োপভোগ ও সকাম কর্ম্মের দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছিল।

প্রবৃত্তিমার্গ যেন ছাতের সিঁড়ি স্বরূপ, ইহা অবলম্বন করে নিবৃত্তিমার্গে ছাতের উপরে উঠতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, কার কিরূপ কর্ম্ম করা উচিত, তা কে নির্দ্ধারণ করবে? ইহা নির্দ্ধারণ করতে একমাত্র সদ্‌গুরুই সক্ষম। যার যেরূপ মানসিক অবস্থা গুরু তার জন্য সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন।

গুরুকরণ করতে হলে গুরুকে বিশেষ পরীক্ষা করে নিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের মত। গুরুর পুত্রকেই গুরু করতে হবে, ইহা সৎশাস্ত্রানুমোদিত নয়। শাস্ত্র বলেন, গুরুকে বিশেষরূপে দেখে তবে তাঁতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। কিন্তু একবার বিশ্বাস করলে আর কোনরূপ সন্দেহ করবে না। পরমহংসদেব তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলতেন, "খুব বাজিয়ে নে।" বিশেষ পর্য্যালোচনা করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি শাস্ত্র ছাড়া কোন কাজ করতেন না। তাঁর জীবন বেদবেদান্তের টীকাস্বরূপ। তাঁর ন্যায় ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ ধর্ম্মরক্ষা করতেই আসেন। হিন্দু, খ্রীষ্টান

প্রভৃতি সকলধর্ম্মের মহাপুরুষগণই একবাক্যে বলে গেছেন যে, তাঁরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র ও ধর্ম্ম রক্ষণের জন্যই এসেছেন, কোনও শাস্ত্র বা ধর্ম্ম ধ্বংসের জন্য তাঁদের শরীর পরিগ্রহ হয় নি।

নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ—স্বার্থশূন্য হয়ে কর্ম্ম করা, আপনাকে ভুলে নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি না করে ভগবানের জন্য কাজ করা। সকল অবস্থাতেই স্বার্থশূন্য হয়ে কাজ করতে পারা যায়। স্বার্থশূন্য হয়ে কাজ করার নামই কর্ম্মযোগ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, স্বার্থপরতা কখনও কারও কি নিঃশেষে ত্যাগ হতে পারে? আমরা দেখতে পাই, কারও স্বার্থ নিজের শরীর মনের উপরেই আবদ্ধ, কারও নিজের পরিবারের উপরে, কারও দেশের উপর, আবার কারও বা সমুদয় জগতে বিস্তৃত। বুদ্ধদেব একটা ছাগলের জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাতেও কি স্বার্থপরতা নেই? অপরের জন্য ঐরূপে প্রাণ বিসর্জ্জনে যে আনন্দ লাভ হয়, উহাই তাঁর স্বার্থ। উত্তরে বলা যেতে পারে, স্বার্থে ঐরূপ বিস্তৃতি ও নিঃস্বার্থতা একই বস্তু। যার মন বুদ্ধি নিজের শরীর মনের উপর আবদ্ধ, সেই যথার্থ স্বার্থপর ও কৃপাপাত্র। নিজের শরীর মন ছেড়ে অপরের সুখে

সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া রূপ স্বার্থই নিঃস্বার্থতা নামে নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে। কারণ, সে স্বার্থ বন্ধনের কারণ না হয়ে মনুষ্যকে মনুষ্য নামের উপযুক্ত করে ও ভগবানের দিকে অগ্রসর করে দেয়। মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নত হতে থাকে, তার স্বার্থ দৃষ্টিও সেই পরিমাণে নিজ শরীর মন প্রভৃতির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে উচ্চ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে থাকে। পরিশেষে তার ক্ষুদ্র আমিত্ব এককালে চলে গিয়ে তার স্থলে এক বিরাট মহান্ আমিত্বের সমাবেশ হয়, যার ঘাত প্রতিঘাত সমগ্র জগৎ জুড়ে হতে থাকে। একেই ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থা বা মুক্তি বলে।

আমরা তিন প্রকারে অপরের উপকার করতে পারি। কেউ ক্ষুধার্ত্ত হলে অন্ন দিয়ে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারি। ঐ উপকার স্থূল শরীরসম্বন্ধীয় ও ক্ষণস্থায়ী, ছয় ঘণ্টা পরে আবার তার ক্ষুধার উদ্রেক ও অভাব বোধ হবে। দ্বিতীয়তঃ, তাকে এরূপ শিক্ষা দিতে পারি, যাতে সে সর্ব্বদা উপার্জ্জন করে নিজের জীবনোপায় নিজে করে নিতে পারে। এই উপকার অনেক দিন স্থায়ী ও মানসিক। তৃতীয়ঃ— আধ্যাত্মিক উপকার; ইহার ফল আরও বিস্তৃত। এর প্রভাবে তার মনের সর্ব্বপ্রকার অভাব-বোধ

চির জীবনের জন্য নিবৃত্ত হয়ে যায়। এইরূপ উপকার ধর্ম্মোন্নত মহাপুরুষেরাই কেবলমাত্র করতে পারেন।

একদিন ভগবান ঈশা রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত হয়ে একটি কূপের নিকট বসে ছিলেন। একজন নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক জল নিতে এল। ঈশা তার নিকট জল পান করতে চাইলে সে আশ্চর্য্য হয়ে বললে, আমার হাতে আপনি জলপান করবেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন ও জলপান করে বললেন, "এর বিনিময়ে আমি তোমাকে যে জল দিব, তাতে তোমার চিরজীবনের মত তৃষ্ণা মিটে যাবে।" এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারদের চরিত্রে এবং পওহারীবাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের জীবনেও দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা যে কাজই করি না কেন, ভগবানের জন্য করছি, নিজের জন্য নয়, এইরূপ ভেবে করতে হবে। সামান্য রাস্তা ঝাঁট যে দেয়, সে যদি সর্ব্বসাধারণকে ভগবানের অংশ ভেবে তাঁর সেবার জন্য রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছি এইরূপ চিন্তা করে, তা হলে তার আর ঐ কর্ম্মে কোন কষ্ট বোধ হয় না। এরূপ কোন

কর্ম্মই নেই, যা সম্পূর্ণ ভাল, অথবা যাতে কিছুমাত্র দোষ নেই। আমরা এই যে ভগবচ্চর্চ্চা করছি, তাতেও সকলে উপকৃত হচ্ছে না; মুখনিঃসৃত উষ্ণ বায়ুতে বায়ুসাগরে ভাসমান কত কীটাণুর মৃত্যু হচ্ছে! সকল কর্ম্মই এরূপে ভালমন্দমিশ্রিত হলেও যদি নিঃস্বার্থভাবে করা যায়, তা হলে উহার দোষ আমাদিগকে স্পর্শ করে না। শরীর রক্ষার উপযোগী আহার শয়নাদি সম্বন্ধেও যদি ভাবা যায় যে, আহার শয়নাদির উদ্দেশ্য শরীর রক্ষা, শরীর থাকলে তবে ভগবৎ সাধনা হবে; অতএব আহার শয়নাদিও ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই করছি, তবে এগুলিও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হল। সকল কার্য্যে ঐরূপ করলে কর্ম্মফলের দিকে আর দৃষ্টি থাকে না ও তজ্জনিত সুখদুঃখে আমাদিগকে আর আক্রান্ত হতে হয় না। কর্ম্ম এইরূপে বন্ধনের কারণ না হয়ে অনুষ্ঠাতার মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি কর্ম্ম অনাদি এবং কর্ম্মের দ্বারাই শাস্ত্র জগতে বৈষম্যের ব্যাখ্যা করেছেন। কর্ম্মের জন্যই এই বৈষম্য হয়েছে। যার যেরূপ কর্ম্ম, সে সেরূপ অবস্থা পেয়েছে। কেউ কেউ এই বৈষম্যের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করে বলেন, জন্মসময়ে গ্রহাদির

শুভ বা অশুভ যেরূপ সংস্থান থাকে, মানুষ সেরূপ অবস্থাপন্ন হয়। শুভগ্রহ থাকলে উত্তম জন্ম হয়, অশুভ গ্রহ থাকলে কুৎসিত জন্ম হয়। এর উত্তরে তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে আমারই বা অশুভগ্রহে জন্ম হল কেন এবং অপরেরই বা শুভগ্রহে কেন জন্ম হল? এই শুভাশুভ গ্রহ আমার জন্মের গতি নির্দ্দেশক হতে পারে, কিন্তু কারণ হতে পারে না। এর কারণ অবশ্য আর কিছু আছে, যার জন্য আমার অশুভ জন্ম হচ্ছে। শাস্ত্র জীবের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মকেই ঐ কারণ বলেন। কেউ কেউ আবার বলেন, পিতামাতার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সন্তানে সংক্রমিত হয়। পিতামাতার রোগাদি পর্য্যন্ত সন্তান প্রাপ্ত হয়। অতএব পিতামাতাই পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যের (Hereditary Transmission) কারণ। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তা হলে সন্তানের জন্মে পিতামাতার মানসিক শক্তির ক্ষয় হওয়া উচিত, কিন্তু তা হতে ত দেখা যায় না। আবার সামান্যশক্তিশালী পিতামাতা হতে কখন কখন অদ্ভুতগুণসম্পন্ন সন্তান জন্মাতে দেখা যায়। উহাই বা কিরূপে হয়? শুদ্ধোদনের ন্যায় অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন; কিন্তু তাঁদের কারও না হয়ে রাজা শুদ্ধোদনেরই কেন বুদ্ধদেবের

ন্যায় উদারহৃদয়, বাল্যকাল হতেই সমাধিমগ্ন সন্তান উৎপন্ন হল? ভগবান বুদ্ধ, ঈশা প্রভৃতি অবতার পুরুষ সকলের কথা ছেড়ে দিলেও মানব সাধারণের ভেতর ঐরূপ ঘটনা নিত্য হতে দেখা যায়। কোথা হতে ঐরূপ হয়? কার্য্য কারণ হতে অধিক শক্তিসম্পন্ন কখনই ত হতে পারে না, তবে কেন ঐরূপ হয়? দেখা যায় কর্ম্মবাদেই কেবলমাত্র ঐরূপ প্রশ্ন সকলের মীমাংসা পাওয়া যায়। মানবের প্রকৃতিই এরূপ যে, অন্যের উপর দোষারোপ করতে পারলে নিজের স্কন্ধে কখন দোষ নেয় না। সেজন্যই সংসারে তার দুঃখ কষ্ট পাবার কারণ স্বরূপে সে—হয় ভগবান্, নয় গ্রহনক্ষত্র, নয় পিতামাতা ইত্যাদিকে নির্দ্দেশ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে! স্বয়ং যে সে তার ঐরূপ কষ্টের কারণ, তা বলা দূরে থাকুক একবার মনেও আনে না! শাস্ত্রই তখন তার চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করে বলে, তোমার কষ্টের কারণ তুমি নিজেই, অপর কেউ নয়। কিন্তু তাতে ভয়ের কারণ নেই। যে শক্তিদ্বারা তুমি এই কষ্ট পাচ্ছ তা দ্বারাই আবার তুমি উন্নত হতে পারবে! দুষ্কর্ম্ম করেছ, তাতে ভয় কি? আবার চেষ্টা কর, অনন্ত শক্তি তোমার রয়েছে, তোমার এ অবস্থার নিশ্চিত পরিবর্ত্তন হবে। বেদ বলেন, "ত্রুটিষ্ঠো

বলিষ্ঠো মেধাবী" পুরুষেরই ধর্ম্মলাভ হয়। সাহস চাই, তেজ চাই; নির্জীব মন ও শরীরের দ্বারা ধর্ম্ম লাভ হয় না। নির্ভীক হৃদয়ে আবার চেষ্টা কর, কর্ম্ম কর, ধর্ম্মপথে নিশ্চয় অগ্রসর হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কর্ম্ম-রহস্য

(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)

নিঃস্বার্থ হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা না করে যে কর্ম্ম করা যায়, তাকে কর্ম্মযোগ বলে। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করলে সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করতেই হবে। একটি কর্ম্ম আবার অন্য কর্ম্ম উৎপাদন করবে। এরূপে কর্ম্মফলভোগ নিয়ত চলতে থাকবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি কর্ম্ম করলেই তার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে কি মুক্তির সম্ভাবনা নেই? শাস্ত্র বলেন, আছে। নিষ্কাম হয়ে নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কর্ম্ম কর। তা হলে আর কর্ম্মফলে লিপ্ত হতে হবে না। বলতে পার, বাসনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম কি করা যায়? কোন না কোন বাসনা হতেই ত কর্ম্মের জন্ম। ভগবদ্দর্শন করব, এটাও ত একটা বাসনা। উত্তরে যা পরমহংসদেব বলতেন তাই বলি, "ভগবদ্দর্শনবাসনা বাসনার মধ্যে নয়। যেমন মিছরি

মিষ্টির মধ্যে নয়।" অর্থাৎ মিষ্টান্ন ভক্ষণের যে অপকারিতা, তা মিছরিতে নেই বললেই হয়। তবে কি কর্ম্ম করাই দোষ? কর্ম্ম কি তবে বন্ধনের উপর বন্ধন এনে মানুষের শ্রেষ্ঠতম জীবনোদ্দেশ্যের পথে নিয়ত বিঘ্ন বাধাই নিয়ে আসে? শাস্ত্র বলেন,—না, কর্ম্মে কোন দোষ নেই। তবে আমরা যে ভাবে কর্ম্ম করি, সেই ভাবানুযায়ী উহা গুণ ও দোষবিশিষ্ট হয়। কর্ম্মে স্বভাবতঃই যদি দোষ থাকত, তবে অত্যাচারীর হস্ত হতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য নরহত্যা করেও মানুষ বীরাগ্রণী বলে পরিচিত হত না। অবলার প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষার জন্য লম্পটকে হত্যা করেও মানুষ আমাদের পূজনীয় হত না, অথবা দারিদ্র্যদুঃখ-কাতর সহৃদয় পুরুষেরা নিজ আত্মীয়বর্গের সুখে উপেক্ষা করেও সমাজে যশোভাগী হতেন না। ভগবৎপ্রসাদ লাভ করে জীবনের চরম সার্থকতা শেখবার ও শেখাবার জন্য আত্মীয় সমাজ প্রভৃতি সমস্ত উপেক্ষা করে সন্ন্যাসি-বর্গও আমাদের শীর্ষস্থানীয় হয়ে থাকতেন না। অতএব দেখা যাচ্ছে, হিংসা হত্যারূপ কর্ম্মও যখন নিজ স্বার্থের জন্য কৃত না হয়ে কোন এক মহদুদ্দেশ্যের জন্য সাধিত হয়, তখন কর্ত্তা দোষভাগী হয় না।

অতএব কর্ম্মে কোন দোষ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্ম্ম ভাল বা মন্দ হয়ে থাকে—কর্ম্মের স্বরূপে কোন দোষ নেই। অগ্নিতে রন্ধন ও গৃহ-দাহাদি উভয় কার্য্যই হচ্ছে, তাতে অগ্নির কোন দোষ নেই। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, সকল জলে পড়ছে, কিন্তু জলের নির্ম্মলতা অনুসারে প্রতিচ্ছায়ার তারতম্য হয়ে থাকে, এতে সূর্য্যের কোন দোষ নেই। তবে কিরূপে কর্ম্ম করলে দোষভাগী হতে হবে না? শাস্ত্র বলেন, যদি স্বার্থ না থাকে এবং কর্ম্মফলে আসক্তি না থাকে; কর্ম্মফলে আসক্তি না থাকলে সুখ বা দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হলেও কর্ত্তার মন বিচলিত হবে না। সুতরাং তা আর বন্ধনের কারণ হবে না।

দেখা গিয়েছে, বাসনা হতেই কর্ম্মের জন্ম। নিজ নিজ মনের দিকে দৃষ্টি করলে মনে নানা বাসনা রয়েছে দেখা যায়। এমন কি, মনটিকে বাসনাময় বা নানা বাসনার সমষ্টি বলে বোধ হয়। সমুদয় বাসনা দূর হলে মনের অস্তিত্ব থাকবে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। আবার দেখা যায় বাসনার সকলগুলিই সমান তীব্র নয়। কোনটি 'এখনই সম্পন্ন হউক' মনে এইরূপ হয়; কোনটি

হলে ভাল, না হলেও ভাল—অপর একটি না হয় তো ভাল হয়, এইরূপ মনে হয়। এই প্রকারে মন ভিন্ন ভিন্ন বাসনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত দেখা যায়। বাসনাটি মনে উঠলেই আবার কার্য্য হয় না। এক দিন, দু দিন, দশ দিন উঠতে উঠতে একদিন মন বলে, এটি না হলেই নয় এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহকে উহা যাতে সফল হয়, তদ্বিষয়ে নিয়োগ করে। ঐরূপ নিয়োগকেই আমরা সচরাচর কর্ম্ম বলে থাকি। অতএব ঘনীভূত বাসনাই কর্ম্মরূপে পরিণত হয়ে পুরুষকে সুখদুঃখরূপ ফল এনে দেয় এবং সেই সুখ দুঃখময় কর্ম্ম আবার অপর একটি সংস্কারের জনক হয়। মনে সঞ্চিত সূক্ষ্ম বাসনা সকলের নামই সংস্কার। ঐ সংস্কার সকলের সমান নয়। কারও কোনটি বাল্যকাল হতে প্রবল। কারও কোন কোন সংস্কার আদৌ নেই। কেউ বা সুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে আজীবন সৎকার্য্যই করে গেল। আবার অন্য কেউ কুসংস্কার-চালিত হয়ে কুকার্য্যকরতঃ লোকের নিন্দাভাজন হয়ে গেল। কেউ বা বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, যশস্বী, কেউ বা তার ঠিক বিপরীত হল।

কোথা হতে সংস্কার এত ভিন্ন ভিন্ন হল?

বাল্যকাল হতেই যখন কাকেও সৎ, কাকেও অসৎ দেখছি, তখন বাসনা ঘনীভূত হয়ে সৎ বা অসৎ সংস্কাররূপে পরিণত হবারই বা সময় কোথায়? অথবা কর্ম্ম ও সংস্কার যদি বৃক্ষবীজসম্বন্ধেই গ্রথিত ও প্রবাহিত হয়ে থাকে, তবে সে কর্ম্মই বা কোথায়, যা শৈশবেও সংস্কাররূপে দেখা দিতে পারে? শাস্ত্র বলেন, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মই বাল্য-সংস্কাররূপে দেখা দেয়। পূর্ব্ব জন্মের সৎ বা অসৎ অভ্যাস ইহজন্মের ভালমন্দ সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয়। এই বাল্যসংস্কারসমূহকে আমরা 'স্বভাব' কথায় বিপরীত অর্থ কল্পনা করে কখন ভগবানে, কখন সৃষ্টিকার্য্যে দোষারোপ করে থাকি। কখনও স্বভাব-শব্দ কারণহীন অর্থে প্রয়োগ করি এবং কখনও বা কোন এক অদৃষ্ট অননুভূত কারণ, যার হস্তে মানুষ যন্ত্রস্বরূপ হয়ে রয়েছে এরূপ অর্থে প্রয়োগ করি। এরূপে মানব কুসংস্কারভারবাহী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হয়ে বা কার্য্যকারণপ্রবাহের মূলোচ্ছেদ করে নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে যথার্থ সত্য হতে বহুদূরে অপনীত হয়।

কর্ম্মবাদ সত্য হলে পুনর্জ্জন্মবাদও তার সঙ্গে অবশ্য সত্যরূপে উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে আত্মা

ক দেহ হতে দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ল দেহ পড়ে থাকে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর সেই জন্মের মুদয় সংস্কার নিয়ে তদুপযোগী দেহ গঠন করে। সই নবীন দেহে তার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল আবার রিস্ফুট হয়। আমরা দেখেছি, পিতামাতার দাষগুণ সন্তানের দেহ ও মন আশ্রয় করে। তার গরণ, সন্তানের কার্য্যফল, যে পিতামাতা তাকে সরূপ দোষ বা গুণযুক্ত সংস্কারসমূহ পরিস্ফুট হবার উপযোগী দেহ দিতে পারেন, সেইরূপ পিতামাতার নকটেই তাকে আকর্ষণ করে। শাস্ত্র বলছেন, জোঁক যেমন এক পাতা হতে অন্য পাতা আশ্রয় করে, আমরা সেইরূপ এক কর্ম্ম হতে কর্ম্মান্তর আশ্রয় করে থাকি। অতএব কর্ম্ম এরূপে করতে হবে, যাতে ক্রমে নিম্নতর হতে উচ্চতর কর্ম্ম অবলম্বন করতে পারা যায়। আবার জোঁক যেমন অপর একটি অবলম্বন গ্রহণ না করে পূর্ব্ব অবলম্বন ত্যাগ করে না, সেরূপ এক কর্ম্ম আশ্রয় না করে অন্য কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না।

নীচ হতে উচ্চ কর্ম্ম কিরূপে অবলম্বন করা যেতে পারে? মহৎ হতে মহত্তর উদ্দেশ্য অবলম্বন কর; দেখবে, তোমার কর্ম্মও উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে

প্রবাহিত হচ্ছে। একেবারে সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য আশ্রয় করে কর্ম্ম করতে পারছ না বলে হতাশ হয়ো না। ধীর দৃঢ়পদে, অসীম সাহসে বুক বেঁধে শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের প্রসাদ ও সাক্ষাৎকার লাভরূপ জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হতে হবে।

আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, সংসারে থাকলে ধর্ম্ম হয় না, ভগবান লাভ হয় না। সংসার কাকে বলে? যে বস্তু আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে দেয় না, তাই সংসার নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত যে সকল সংস্কার আমাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, সর্ব্বদা সত্যো-দ্দেশ্য হতে বিচলিত করছে, তাই আমার সংসার। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সংসার বর্ত্তমান রয়েছে। কারও কাম, কারও ক্রোধ, কারও ধনচিন্তা ঈশ্বরপথের কণ্টক। এইরূপ বিশেষ বিশেষ সংসার হতে মনের গতি ফেরাতে কোন উচ্চ উদ্দেশ্য অবলম্বন করতে হবে। ঐরূপ করলেই, যে কর্ম্ম-স্রোত এতকাল নীচের দিকে যাচ্ছিল, তার বেগ ফিরে অন্য দিকে চালিত হবে এবং যা পূর্ব্বে ঈশ্বরপথের প্রতিবন্ধক ছিল, তাই আবার ঈশ্বরপথের সহায় হয়ে দাঁড়াবে। সংসারে থেকেই ঐরূপ

়তে হবে। আমাদের সকলেরই ভেতর মহাশক্তি
়মান রয়েছে। অজ্ঞানে আবৃত আছি বলেই
মরা তা বুঝতে পারছি না। শারীরিক ও
নসিক শক্তির অপব্যয় না করে উচ্চতর পথে চালিত
়তে হবে; তা হলেই আমরা ঈশ্বরের দিকে
গ্রসর হতে পারব। দেখা গিয়েছে, কর্ম্মে কোন
াষ নেই; দোষ আছে কেবল যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা
র্ম্ম করি তাতে; কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম কর, কর্ম্মকে
ালবেসে কর্ম্ম কর, ফলের দিকে লক্ষ্য রেখো না।
। হলে কর্ম্ম আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে
াবেই যাবে। ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপ খেলার ভেতর বন্ধন
ক্ত হবার, তাঁকে পাবার এই প্রণালী বিদ্যমান
়য়েছে। এরূপে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে
়ব।

এরূপে কর্ম্ম করলে কালে যথার্থ নিঃস্বার্থতা
়সে উপস্থিত হবে। প্রশ্ন হতে পারে, সম্পূর্ণ
াঃস্বার্থ হলে আর কি সে কোন কর্ম্ম করতে পারে
করে থাকে? শাস্ত্র বলেন, সমুদ্রবৎ গম্ভীর,
মেরুবৎ স্থির নিঃস্বার্থ পুরুষ কেবল জগতের কল্যাণের
ামিত্ত কর্ম্ম করেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই সাক্ষাৎ
গবান জেনে তিনি সেই বিরাট পুরুষের সেবা করেন।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি কর্ম্মই আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ পিতামাতার দ্বারা দেহ ধারণ করায়, তা হলে অবতারাদি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রপ্রমাণ আছে, যে তাঁরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের সহধর্ম্মিণীই পুনরায় তাঁদের সহিত জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে এই নিত্যসম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হয়? ইহা কি সৃষ্টি-প্রণালীর একটি বিশেষ নিয়ম? কার্য্যকারণময় কর্ম্ম-প্রবাহের বেগ জগতের সর্ব্বত্র ধাবিত রয়েছে, এর মধ্যে বিশেষ নিয়ম কিরূপেই বা সম্ভবে? আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করে ভগবান যখন মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেই অবতীর্ণ হন, তখন নিজের সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তন না করলে তাঁর শিক্ষাপ্রদানেরই বা সার্থকতা থাকে কোথায়? স্বল্পশক্তি ভিন্ননিয়মাধীন মানবই বা সে শিক্ষা নিতে পারবে কিরূপে? পিতা-মাতা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত ত আমাদিগের নিত্যসম্বন্ধ বর্ত্ত-মান নেই। তবে অবতারাদি সম্বন্ধে এরূপ হবার কারণ কি? এর উত্তর, অবতার পুরুষের সাঙ্গোপাঙ্গ-গণ তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসেছিল, সেই জন্য তারা তাঁর সহিত নিত্যসম্বন্ধ। আমরা স্বার্থের জন্য ভালবাসি। পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সকলকেই

আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবেসে থাকি। স্ত্রীর সুখের জন্য যদি তাকে ভালবাসতাম, তা হলে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য হত। কিন্তু আমরা কি তা করি? ভালবাসার স্বরূপ স্বাধীনতা—দাসত্ব নয়। নিঃস্বার্থতা, সুখলালসা নয়। যখনি কাকেও যথার্থ ভালবাসবে, তখনি তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তার সুখ দেখতে হবে, নিজের সুখ দেখলে চলবে না। কিন্তু আমরা কি করে থাকি? যাদিগকে ভালবাসি, তাদিগকে আপনার অধীন করতে যাই। আমার কথা শুনবে, আমি যা ভাল বুঝি, তাকে তাই ভাল বুঝতে হবে। এরূপে তাদিগকে ঘোরতর বন্ধনে বদ্ধ করতে যাই। এ জন্যই আমাদের সম্বন্ধ-বন্ধন নিয়ত ছিন্ন হচ্ছে এবং আমরা পরস্পর বিপরীত কেন্দ্রে উপস্থিত হচ্ছি। বিদ্যুতাদি জড়-শক্তিকে আয়ত্ত করতে গেলেও যখন তার স্বভাব কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিশেষরূপে জেনে সেই উপায়ে অগ্রসর হতে হয়, তখন অনন্ত স্বাধীনতাস্বভাব মনুষ্য-মনকে কি তার স্বভাববিরুদ্ধ প্রণালীতে বশীভূত করে রাখতে পারা যায়? কোনও না কোন দিন তার সেই বন্ধন অসহ্য হয়ে উঠবে এবং স্বভাবনিহিত নিদ্রিত শক্তি জাগরিত হয়ে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে।

আমাদের দেশে এইরূপ ভালবাসা এখন অত্যন্ত প্রবল। দাসত্ববন্ধনই এর অপর নাম। সেই জন্য দেশেরও এত দুরবস্থা। শাস্ত্র বলেন, সমগ্র জগৎ এক সূত্রে গ্রথিত রয়েছে। সেই জন্যই একের অপকারে অপরের অপকার হচ্ছে। একের দোষে অপরে কষ্ট পাচ্ছে। অন্যের অমঙ্গল হলে আমাকেও তার জন্য কষ্ট পেতে হয়। এরূপ নিয়ম বর্ত্তমান থাকতে অপরকে অধীন করে নিজে উচ্চ হবার চেষ্টা কখনই সিদ্ধ হতে পারে না। এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম জড় হতে চেতন পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে মহাবেগে প্রবর্ত্তিত রয়েছে। এক পরমাণু অপর হতে বিযুক্ত হতে চেষ্টা করছে। পৃথিবী সূর্য্য হতে এবং সূর্য্য সূর্য্যান্তর হতে পলায়ন করতে চেষ্টা করছে। চোর এই স্বাধীনতার প্রেরণায় যথার্থ পথ না জানায় চুরি করছে আবার সাধু মহাপুরুষেরা ঈশ্বরকৃপায় স্বার্থহীন বিশুদ্ধ ভালবাসাই এই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ জেনে দিন দিন জীবনের মহান্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামই মনুষ্যকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাচ্ছে এবং অবশেষে পূর্ণ জ্ঞানভক্তিতে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করে অনন্ত শক্তির অধিকারী করে

দিচ্ছে। এ স্বাধীনতালোপ জগতে কে কারই বা করতে পারে? স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু, গুরু প্রভৃতির সহিত যদি নিত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হতে চাও, তা নিজের স্বার্থকে বলি দিয়ে তাদের সুখে সুখী হও। ভগবানের মূর্ত্তি জেনে তাদের সেবায় রত থাক। জগতের যাবতীয় স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ও পুরুষকে দেবতাজ্ঞানে দর্শন করতে চেষ্টা পাও ও তাদের প্রতি তদ্রূপ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন কর।

এখন বেদান্তের বিবর্ত্তবাদের বিষয় কিছু বলে আজকার বক্তব্য শেষ করব। আমরা এই সৃষ্টিকার্য্য দুই দিক্ দিয়ে অবলোকন করতে পারি। মনুষ্যের দিক্ দিয়ে দেখলে আমরা সৃষ্টি, তার ক্রম, নিয়ম, শক্তি প্রভৃতি এবং পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান, হিতাহিত প্রভৃতিকে সত্য বলে দেখতে পাই। কিন্তু যদি কল্পনা সহায়ে ভগবানের দিক্ হতে এই সৃষ্টি দেখবার চেষ্টা করি, তা হলে কি দেখি? সৃষ্টি ও সৃষ্টির ভেতরের কিছুরই বিদ্যমানতা দেখতে পাই না। কারণ, সৃষ্টি ত সেই ভগবানেই রয়েছে। তিনি ছাড়া ত সৃষ্টিতে কিছুই অপর নেই। অতএব যদি কেউ কোন উপায়ে জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের ন্যায় দৃষ্টি লাভ করতে পারে, তবে সে আর কখনই জগৎকে আমাদের মত

দেখতে পারে না। জগৎ দেখতে হলে আপনাকে জগৎ হতে অন্ততঃ কিছু ভিন্ন না করে উহা কখন দেখা সম্ভবে না। অতএব যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার সহিত সর্ব্বতোভাবে একত্ব অনুভব করেছেন তাঁর নিকট জগতের অস্তিত্ব নেই। এই শেষোক্ত অবস্থাই বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ নামে কথিত হয় এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হতে হলে জগতের অস্তিত্ব, পাপপুণ্য প্রভৃতি সমুদয় সত্য বলে মেনে নিয়ে বহুকাল কর্ম্মভক্তিজ্ঞান-যোগাদি দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করতে হবে। তবেই আমাদিগের পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণ একত্ব বোধ এসে উপস্থিত হবে। সেই বাক্যাতীত অবস্থার এক্ষণে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

উপসংহার *

রামকৃষ্ণ মিশনসভা, ২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৮৯৮)

পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আজ তার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব। কারণ, তা হলে সে সকল বিষয় মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হবে। প্রথমে আমরা দেখেছি, বেদ কাকে বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান; ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, যা তাঁর সহিত অনন্তকাল অবস্থিত রয়েছে। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, বেদ অনাদি। যদিও আমরা উহা পুস্তকাকারে লিখিত দেখতে পাই, কিন্তু এই পুস্তকের যা বিষয় তা তিনকালেই বর্ত্তমান, তার আদি নেই! এই অনাদি জ্ঞান কখন কোনও ভাগ্যবানের নিকট আবির্ভূত হয়। যাঁরা এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করেন, তাঁদিগকে ঋষি বলে। ঋষি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা। এই

---

* এই বক্তৃতায় বক্তা, রামকৃষ্ণ-মিশন-সভায় তাঁর বক্তৃতা সমূহের (বেদকথা, স্মৃতি-রহস্য, সাধন-নিষ্ঠা, কর্ম্মের দ্বিবিধরূপ ও কর্ম্ম-রহস্য) সংক্ষেপে আলোচনা পূর্ব্বক উপসংহার করেছেন।

জ্ঞান কেবল যে বিশেষ কোন এক জাতির অথবা পুরুষের নিকটেই আবির্ভূত হয় তা নয়। ম্লেচ্ছাদি নীচ জাতিসম্ভূত কোন কোন পুরুষেও কখন কখন ঐ জ্ঞানের আবির্ভাব দেখা গিয়েছে। আবার বেদে অনেক স্ত্রীলোকও ঋষি বলে কথিত হয়েছেন। সত্যকামাদি জারজ ব্যক্তিও ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ঋষি বলে অভিহিত হয়েছেন। এই জ্ঞান জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিকট উপস্থিত হতে পারে। পূর্ব্বে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত ছিল বলে বোধ হয় না। ইহা গুণগত ছিল। আবার বেদের স্থলে স্থলে এইরূপ উক্তিও দেখা যায় যে, পূর্ব্বে সকল মনুষ্যই একবর্ণভুক্ত ছিল। উহার কোন কোন স্থানে এরূপ কথাও আছে যে, পূর্ব্বে কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল, পরে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হল। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে একথা সম্ভব বলেও বোধ হয়। বেদের প্রাচীন অংশ ঋগ্বেদে দেখতে পাওয়া যায় যে আর্য্যগণ পঞ্চনদের গুণ গান করছেন এবং আপনাদের পূর্ব্ব বাসস্থান অত্যন্ত শীতল বলে বর্ণনা করছেন। এই সময়ে তাঁরা নূতন দেশে এসে আদিম নিবাসীদিগের সহিত কখন কখন যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হতেন এবং স্বভাবতঃ ধর্ম্ম বা গুণ অনুসারে সকলেই এক জাতিনিবদ্ধ ছিলেন।

পরে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত ও অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়াতে তাঁদের মধ্যে কতক লোক ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত স্বভাব-প্রেরিত গুণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, যজ্ঞোপাসনাদি কর্ম্মানুসারেই হওয়া সম্ভব। কারণ, গুণ কর্ম্মানুসারে জাতিবিভাগ চির-কালই জগতে বর্ত্তমান রয়েছে ও থাকবে। কিন্তু জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির সহিত ক্রমশঃ তিরোধান হবে। এই ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি গুণ আবার ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। কোন জাতি ব্রাহ্মণত্বগুণসম্পন্ন, যেমন প্রাচীন আর্য্যগণ ছিলেন। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরা ক্ষত্রিয় গুণসম্পন্ন। ইংরাজ জাতিতে বৈশ্যগুণের অধিক সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোন এক গুণকে অধিক প্রবল হতে দেখা যায়। বর্ত্তমান কাল বৈশ্য-গুণপ্রধান। বৈশ্যগুণহীন লোকের একালে অধোগতি প্রাপ্তি হচ্ছে। যাদের ঐ গুণ প্রবল, তারাই উন্নত হচ্ছে। মহাভারতেও আমরা পূর্ব্বোক্ত কথা দেখতে পাই যে, পূর্ব্বে এক জাতি ছিল, পরে গুণ কর্ম্ম ভেদে জাতি-ভেদ হয়েছে। ভগবান গীতায় বলেছেন, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা আমি চারবর্ণ সৃষ্টি করেছি।

অতএব সদ্‌গুণসম্পন্ন হলেই বেদে অধিকার হত ও এখনও হওয়া উচিত। আমরা দেখেছি, বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হওয়ার কথা আছে। স্বর্গ অর্থে পৃথিবী অপেক্ষা কোন উচ্চতর লোক, যেখানে অধিককালস্থায়ী সুখ ভোগ করতে পারা যায়। কিন্তু এই সুখ ভোগের পর আবার মর্ত্ত্যলোকে আসতে হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবতা সকল, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি একএকটি পদ-মাত্র। শাস্ত্রে দেখা যায়, কর্ম্মদ্বারা উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়ে কেউ কেউ ইন্দ্রাদি হয়েছেন ও সেই পদে কিছু দিন অবস্থান করে আবার তাঁর পৃথিবীতে পতন হয়েছে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব পদ লাভ করতে পারেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ড স্বর্গাদি লোক লাভের উপায় বলে দেয়। কিন্তু ঐ সকল সুখও নিত্য নয়। সেই জন্য মনুষ্য তাতে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। তার প্রাণ নিত্যবস্তুলাভের জন্য লালায়িত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সেই নিত্য পদার্থের বিষয়ই বর্ণিত আছে। আমরা দেখেছি, শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলেছেন। অন্যান্য ধর্ম্মে সৃষ্টির আদি আছে, এরূপ কথা বলে। বলে, এমন এক সময় ছিল, যখন

? আদৌ ছিল না। ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন। কিন্তু
ī তা বলেন না। সৃষ্টির আদি আছে বললে
াবানে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ এসে পড়ে।
গতের এই যে বিষমতা দেখছি, কেউ পণ্ডিত,
কউ মূর্খ, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী ইত্যাদি, সৃষ্টির
াদি থাকলে ঈশ্বর তার কারণ হন এবং
াকে পক্ষপাতিত্ব দোষের ভাগী হতে হয়।
বতীয়তঃ তাঁকে নিষ্ঠুরও বলতে হয়। সৃষ্টি অনাদি
লেও সৃষ্টির বিকাশাবস্থা চিরকাল থাকবে না।
াস্ত্র বলেন, কখন প্রকাশিত এবং কখন লুপ্তাবস্থায়
থকে বীজ হতে বৃক্ষ ও পুনরায় বৃক্ষ হতে
ীজের ন্যায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সৃষ্টির ঐ দুই ভাব অনাদি-
কাল হতে প্রবাহিত রয়েছে। যেমন ক্ষুদ্রতম বীজ
হতে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার সেই বৃক্ষ
কালে বীজে পরিণত হয়, সেইরূপ সৃষ্ট জগৎ কখন
ীজরূপে ও কখন প্রকাশরূপে বর্ত্তমান রয়েছে।
ইহা ভগবান হতে নির্গত, ভগবানেরই অংশ, তাঁ
হতে ভিন্ন নয়। গীতাদি শাস্ত্রেও দেখা যায় ভগবান
বলছেন, জগৎ আমার এক অংশ মাত্র। যদি
সৃষ্টি অনাদি হল, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি?
শাস্ত্র বলেন, এই বৈষম্যের কারণ কর্ম্ম। সুতরাং

কর্ম্মও অনাদি। আমাদের সকলকেই কর্ম্ম করতে হচ্ছে। কর্ম্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। কর্ম্মের সহিত তার ফল নিত্যসংযুক্ত হয়ে রয়েছে। কর্ম্ম করলে তার ফলভোগ করতেই হবে; তবে মুক্তি কিরূপে সম্ভবে? নিষ্কাম ভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করলে কর্ম্মফলে লিপ্ত হতে হয় না এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা সমগ্র বন্ধন নাশ করে দেয়। একেই কর্ম্মযোগ বলে। এক কথায় বলতে গেলে স্বার্থশূন্য হওয়াই ধর্ম্ম। কি কর্ম্মযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি জ্ঞানযোগী, সকলেই নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করছে। কেউ 'আমি আমি' করে, কেউ বা 'তুমি তুমি' করে পূর্ণ নিঃস্বার্থতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সকলেই ছোট স্বার্থপর 'আমি' জ্ঞান, ভূমা মহান্ 'আমি'তে ডুবাতে চেষ্টা করছে। কেউবা সর্ব্বভূতে সেই এক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে সেই মহান্ আমিকে সকলের ভেতর দেখতে চেষ্টা করছে। অপর কেউ ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই সর্ব্বত্র দেখতে চেষ্টা করছে। বুঝে দেখলে দুই পথের উদ্দেশ্য একই বলে প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখেছি, কর্ম্মে কোন দোষ নেই। কর্ম্মের ভাল মন্দ গুণ আমাদের নিজের মনোগত ভাব বা

দশ্য নিয়ে হয়ে থাকে। আমরা যখন যে ভাবে
র্য্য করি, আমাদের ঐ কার্য্য তখন সেই ভাবানুসারে
মাদিগকে উন্নত বা অবনত করে ভাল বা
দ বলে প্রতীয়মান হয়। একটি কার্য্য আশ্রয়
করে আমরা অন্য একটি কার্য্য পরিত্যাগ করতে
ারি না। নীচ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে উচ্চতর কর্ম্ম
হণ করতে আমাদিগকে সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত থাকতে
বে। তা হলেই ক্রমে নিঃস্বার্থ হতে পারব।
য ঘোর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, সে বিবাহ করে এক স্ত্রীতে
ন নিবদ্ধ রাখলে তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাই
বে, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবাহ তদ্বিপরীত
স্বার্থপরতা বুদ্ধিরই পরিচায়ক হবে। অতএব একের
পক্ষে যা নিঃস্বার্থ কর্ম্ম, অপরের পক্ষে আবার
স্বার্থপর কর্ম্ম। যে, যে অবস্থায় অবস্থিত তার
সম্বন্ধে যা ঈশ্বরপথে অগ্রসর হবার প্রতিবন্ধকতা
করে, তাই তার সম্বন্ধে সংসার। সেই সংসার
তাকে ত্যাগ করতে হবে। কারও কাম, কারও
ক্রোধ, কারও বা ধন, ঈশ্বর পথের কণ্টক; তাকে
তাই পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পরিত্যাগ
করতে হলে পূর্ব্বে আর এক উচ্চতর বিষয় অবলম্বন
করতে হবে। এরূপে ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতর

অবস্থায় উঠতে হবে, নিঃস্বার্থ হবার জন্য চেষ্টা করতে হবে, এরূপে কালে সকলেই আমরা এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হব, যখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে কার্য্য করতে পারব! আমরা দেখেছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কার্য্যানুসারে মানব পর পর জন্মে উন্নতাবনত দেহাদি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা মনুষ্য এরূপ পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, যাঁরা তাকে ঐরূপ দোষ বা গুণযুক্ত দেহাদি প্রদান করতে পারেন। সেজন্য আপাততঃ দেখলে, সন্তানের দোষ গুণ অনুক্রামিত হওয়ার কারণ পিতামাতাই বলে বোধ হয়, কিন্তু তা নয়; বাস্তবিক সন্তানের কর্ম্মই ঐরূপ পিতা-মাতাকে অন্বেষণ করে নেয়। প্রশ্ন হতে পারে কর্ম্ম করবার শক্তি কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আমরা দেখেছি, এই দৃষ্ট স্থূল ব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট দেহ। আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র দেহ সেই বিরাটেরই অংশ মাত্র। সেইরূপ আমাদের মনসমূহও সেই বিরাট মনের অংশ মাত্র। অতএব আমাদের শরীর ও মনের পুষ্টি সেই বিরাট শরীর ও মন হতেই নিত্য হচ্ছে। আহার ও নিঃশ্বাসের দ্বারা শরীরে যা গ্রহণ করি, তা সেই অনন্ত বিরাটেরই অংশ। আমরা না জানলেও আমাদের মনের পুষ্টিও সেইরূপ

রাট মন হতেই হয়ে থাকে। নূতন জল যেমন
াবর্ত্তে আসছে ও যাচ্ছে কিন্তু আবর্ত্ত একই রূপ
খছি, সেইরূপ দেহ ও মন একই রূপ দেখতে
াকলেও বিরাট দেহ ও মন হতে তাদের
পাদান আমরা অবিরত গ্রহণ করছি। এজন্য
াস্ত্র বলেন, ভগবানের অনন্ত শক্তি সকলেরই
ান্তরে নিহিত রয়েছে। তাঁ হতেই আমরা নিজ
নিজ শক্তি গ্রহণ ও বিকাশ করছি। এই শক্তির
অপব্যয় না করে উহাকে উচ্চ হতে উচ্চতর কার্য্যে
নিযুক্ত করতে পারলেই জীবনের মহান্ লক্ষ্যে
আমরা উপনীত হতে পারব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আপ্তপুরুষ ও অবতারকুলের জীবনানুভব

বেদই হিন্দুর জাতীয় ধন, হিন্দুর আচার ব্যবহার বিশ্বাস আস্তিক্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের ভিত্তি। ইহ-কালে সে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে অন্য সকল দেশের অন্য সকল জাতির, অন্য সকল ধর্ম্মের আচারাদি অগ্রাহ্য করে থাকে এবং দেহাবসানে মৃত্যুর মোহান্ধ-কার এসে যখন ইহ-জগতের চিরপরিচিত সুখ দুঃখ, লাভ লোকসান, যশ অপযশ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহের একপ্রকার সাময়িক সমতা এনে দেয়, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত কল্পনায় করালায়িত পরকালের ছবি দেখতে সে, বেদোক্ত বিশ্বাস ও শিক্ষা সহায়েই আশায় নির্ভর করে "তপ্তা বৈতরণী"তে ঝম্প প্রদান করে।

বলা যেতে পারে, একথা কিরূপে সত্য হতে পারে? কোথায় সে আহুতিসমুত্থিত পর্জ্জন্যপ্রসবকারী যজ্ঞীয় ধূম? কোথায় সে গোমেধ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-সমূহ? কোথায় সে সোমরসপানে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে যজমান-কল্যাণকারী মিত্র মরুৎ পূষণ ভগ প্রভৃতি

দিক দেবগণ? কোথায় সে সত্যনিষ্ঠ অপ্রতিগ্রাহী
ক্রিয়াপ্রাণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ? কালরাত্রির গভীরান্ধকারে
রূপ লুক্কায়িত যে, কোন কালে তাঁদের অস্তিত্ব ছিল
 না, সে বিষয়ে সন্দিহান হতে হয়।

উত্তরেও বলা যেতে পারে, যুগবিপর্য্যয়ে পরি-
র্ত্তনের খরস্রোত ঐ সমস্ত পুনঃ পুনঃ ভেঙ্গে অভিনব
প এবং ভাবে গড়লেও মধ্যে মধ্যে এমন নিদর্শনও
খে গিয়েছে, যা দ্বারা বেশ বোধ হয়, হিন্দুর
খনকার আচার ব্যবহারাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগানুষ্ঠিত
াচারাদির উপর ভিত্তি স্থাপন করেই দণ্ডায়মান।
কটির অপরটির সহিত সাদৃশ্য—বর্ত্তমান বংশধরের
অতিবৃদ্ধ পিতামহাদির সহিত জাতি, বংশ এবং গুণগত
সাদৃশ্যের ন্যায়। বর্ত্তমান ভাষার সহিত পূর্ব্বকার ভাষারও
ঠিক সেই সম্বন্ধ। প্রাচীন তত্ত্ব সকল দিন দিন যতই
আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততই একথা চিরস্থদূর মরীচিকার
রাজত্ব হতে ইন্দ্রিয়োপলব্ধ প্রত্যক্ষ রাজ্যের নিকট হতে
নিকটতর হচ্ছে।

অতএব হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার আশা-ভরসার স্থল যে বেদ
একথা স্বতঃই প্রমাণিত। আমরা উৎকৃষ্টই হই বা
পৃথিবীর অপরাপর জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্টই হই,
আমাদের জাতীয়ত্বের মূল ঐ বেদেই রয়েছে। ঐ বেদ

নিয়ে আমরা পূর্ব্বে উঠেছিলাম এবং যদি আবার উঠতে হয়, তা হলে ঐ মূলাবলম্বনেই উঠতে হবে।

বৃক্ষশরীর হতে নিত্যবিগলিত শুষ্ক পত্র রাশির ন্যায় ধর্ম্মশরীর হতে নিয়ত পরিত্যক্ত আচার রাশির কথা এখন দূরে থাক। ধর্ম্মশরীরের যে অংশগুলি যুগে যুগে একরূপ থাকে, তাই চিরকাল আমাদের জাতীয়ত্বের মূলে রয়েছে ও থাকবে এবং ঐ মূল কোনরূপে বিনষ্ট হলে আমাদের জাতীয় জীবনও চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হবে। মনে কর, হিন্দুর সমাধি অবলম্বনে জ্ঞানের উচ্চ ভূমিতে আরোহণে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে ভোগ সুখ এবং বংশবিস্তারে ব্যয়িত শক্তির মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহে এবং ঐ উপায়ে ইহ জীবনেই মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তি বিষয়ক ধারণা, আত্ম-সংযমেই জাতিগত এবং ব্যক্তিগত পুরুষার্থ, ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ, আত্মার পূর্ণত্ব, অব্যয়ত্ব ও অবিনাশিত্ব, কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রভৃতি বিশ্বাসনিচয়, যা বৈদিক যুগ হতে এখনও পর্য্যন্ত সমভাবে বংশ হতে বংশানুগত হয়ে প্রবাহিত রয়েছে, সে সকলের লোপ হলে আমাদের জাতীয়ত্ব বা অপর জাতি হতে পার্থক্য আর কোথা থাক্‌বে? এবং ঐরূপ হলে সমগ্র

ধর্ম্ম-শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের অস্তিত্বেরও লোপ হবে না?

প্রশ্ন হচ্ছে, এখন বেদের বেদত্ব কি নিয়ে? কোন্ শক্তি প্রভাবে উহা সমগ্র হিন্দু মনে আবহমান-কাল ধরে এই অদ্ভুত প্রভুত্ব স্থাপন করে বর্ত্তমান? যোগিজননিষেবিত, মুক্তি অলক্তক-রঞ্জিত কমনীয় শ্রুতি-পদে কেনই বা সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত প্রভৃতি অশেষ সম্প্রদায়ের ভক্তিনম্রশিরসমূহ সর্ব্বদা নত রয়েছে? কেনই বা নিরীশ্বরবাদী কপিলাদি মহামুনিগণ স্বকীয় প্রতিভা প্রভাবে সকল বিষয় অতিক্রম করে বেদের প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ হন নাই? এর নিশ্চিত কোন গূঢ় কারণ আছে; কোন অপূর্ব্ব সর্ব্বজনমিলন-ভূমি সাধারণ সত্য আছে, যা প্রত্যক্ষ করেই সেশ্বর নিরীশ্বরাদি অতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ীরাও এককালে একবাক্যে এর প্রভুত্ব স্বীকার করেছেন। সেটি কি?

হিন্দুর বিশ্বাস,—বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত নয়—পুরুষনিঃশ্বসিত অর্থাৎ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ; অতএব নিত্য অর্থাৎ ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাদি কালত্রয়েরও পূর্ব্ব হতে ঈশ্বরের সহিত সদা বর্ত্তমান, ঈশ্বরের স্বরূপ বিশেষ। বেদরাশিলিপিবদ্ধ

জ্ঞান, ঐশ্বরিক জ্ঞানের মানববুদ্ধিগ্রহণযোগ্য আংশিক বিকাশ মাত্র। অতএব ঐশ্বরিক জ্ঞানকে যেমন ঈশ্বরের স্বরূপ হতে কখন ভিন্ন করা যায় না, সেইরূপ বৈদিক জ্ঞানও তাঁ হতে অভিন্ন—তাঁর স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বেদের অপর একটি নাম আপ্তবাক্য অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অবাঙ্-মনসোগোচর ঈশ্বর স্বরূপ, সমাধি অবলম্বনে সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করে যাঁরা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের বাক্য বা শিক্ষা।

ভারতের সকল দার্শনিকেরাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সমাধিই সত্য লাভের একমাত্র পথ। সমাধির সাধারণ অর্থ চিত্তের একাগ্রতা। এই চিত্তের একাগ্রতার আবার তারতম্য আছে। সেই তারতম্য অনুসারে মহামুনি পতঞ্জলি সমাধির সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প এই দুই বিভাগ করেছেন। অপরাপর বিষয়ক চিন্তাপ্রবাহসমূহকে তৎকালের নিমিত্ত তিরোহিত বা স্থগিত করে একবিষয়ক চিন্তা-প্রবাহে মন কেন্দ্রীভূত হলে তাকে সবিকল্প সমাধি বলা যায়। মনের এই অবস্থায় যে বিষযক চিন্তাতরঙ্গে মন কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সেই বিষয়ক সত্য উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞান, বাণিজ্য,

কবিত্ব, শিল্প, ঔষধ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অদ্যাবধি যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে, তা ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা সহায়ে মানবমনের তত্তৎ বিষয়ে ঐরূপ কেন্দ্রীভূত হবার ফলে। ধর্ম্মবিষয়ক সত্য উপলব্ধি করতে যেমন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন, ঐ ঐ বিষয়েও তদ্রূপ। কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে ধর্ম্ম সংক্রান্ত পদার্থ নিচয়ের উপর, এবং ঐ সকল বিভিন্ন বিষয়ে তত্তৎ বিভিন্ন বিভিন্ন পদার্থ সমূহ নিয়ে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করতে হয়, এই মাত্র ভেদ। রাসায়নিক তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হয়ে নাম-জপাদি করলে হবে না বা ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্বের উপলব্ধির নিমিত্ত যন্ত্রসহায়ে পদার্থ নিচয়ের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণাদিতে নিয়ত রত থাকলে চলবে না। ইত্যাদি।

সবিকল্প সমাধি নানাভাব নানাবিষয় নিয়ে নানা-প্রকারের হলেও নির্ব্বিকল্প সমাধি একই প্রকার। উহাতে একবিষয়ক চিন্তাতরঙ্গপরম্পরা না থেকে কেবল মাত্র একটি চিন্তা বর্ত্তমান থাকে এবং গাঢ়াবস্থায় তারও জ্ঞান থাকে না। তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান, যা মানব মনের প্রত্যেক উপলব্ধির দৃঢ় ভিত্তি-স্বরূপ, তাও একত্রে মিলে যায় এবং এক ব্যতীত অন্য পদার্থের জ্ঞানাভাবে একের জ্ঞানও তিরোহিত হয়ে

যায়। একেই যোগীর নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ হয়ে সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করে অবস্থান বলে। তখন শরীর জড়বৎ, ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব ব্যাপারশূন্য, মন বুদ্ধি এককালে স্তব্ধ এবং জগতের কোলাহল সুদূর পরাহত হয়ে থাকে।

ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকেরা উক্ত সমাধি অবস্থায় শরীরেন্দ্রিয়াদির জড়বৎ অবস্থিতি এবং কোন কোন শারীরিক রোগবিশেষের সহিত বাহ্যিক সৌসাদৃশ্য দেখে উহাকে মানবসাধারণের চৈতন্যাবস্থা হতে নিম্ন ভূমির অবস্থা বলে স্থিরসিদ্ধান্ত করেছেন। চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিত সমূহের যখন ঐরূপ ধারণা, তখন ভোগলোলুপ সকাম কর্ম্মৈকপ্রাণ সাধারণ পাশ্চাত্য মানব যে উক্তাবস্থা লাভ ভীতির চক্ষে দেখবে বা কারও উক্তাবস্থার বিন্দুমাত্র লাভ হলে তাকে দয়ার পাত্র বিবেচনা করবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পাশ্চাত্য দেশ সমূহ ভ্রমণকালে বর্ত্তমান লেখককে নিত্য এই প্রশ্নের বারবার উত্তর দিতে হত যে প্রাচ্যদর্শননিবদ্ধ সমাধি অবস্থা জড়াবস্থা নহে বা গাছ পাথরের মত হয়ে সুখ দুঃখের হাত অতিক্রম করা নহে; এবং জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতার ভেতর দিয়ে যে জ্ঞান

চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয়, তা ঐ তিনের একত্র মিলিতাবস্থায় অনুভূত জ্ঞান চৈতন্যের অপেক্ষা সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট ; এবং এখনও পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা কোন কোন ভাগ্যবান ভারতে লাভ করে থাকেন ; এবং জড় হওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের ভেতর দিয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোমুখী অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হয়ে জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে এবং জ্ঞানের চরম সীমায় অদ্বৈত বোধে উপনীত হওয়ার সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু চির সংস্কারের প্রবল প্রভাবে সে কথা ধারণা হবে কেন? আবার পরদিন সেই ব্যক্তিই পুনরায় সেই প্রশ্নের সমুত্থান করত। একদিন একজন দার্শনিক বন্ধু সমাধি এবং অদ্বৈতবোধ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে এবং অনেক তর্ক বিতর্ক করে পরিশেষে বলেছিলেন, "তুমি যা বলেছ, তাতে ভ্রম প্রমাদ কিছু মাত্র নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে ঐরূপ সমাধিস্থ পুরুষ একজনও জন্মে না। সেজন্যই আমাদের ওকথা হৃদয়ঙ্গম হওয়া এত কঠিন।" শুনে মনে হল, সত্যই বটে। চিরপদদলিত ভারত এ বিষয়ে সকল দেশাপেক্ষা এখনও ধনী। জড়বাদ, সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদাদি চার্ব্বাক মতসকল চূর্ণ করে যথার্থ ধর্ম্মালোক দিবার শক্তি ভারতেই রয়েছে।

ভারতই তা পূর্ব্বে অপরাপর দেশবাসীকে দিয়েছে এবং এখনও মুক্তহস্তে ঐ ধন বিতরণ করে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করবে। নিরাশায় আশার সঞ্চার হল। মনে হল, দরিদ্র এবং বিজিত হলেও আমাদের এ বিষয়ে কেউ পরাজিত করতে সমর্থ হয় নি। আমাদের ধর্ম্মবীরগণেরই পদপ্রান্তে নত হয়ে এই অপূর্ব্ব আলোক সকল দেশবাসীকে নিয়ে যেতে হবে।

অকুতোভয় হিন্দু দার্শনিক অপরিবর্ত্তনীয় দেশ-কালাতীত সর্ব্বকরণ-কারণ নিত্য সত্যের উপলব্ধি পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা অসম্ভব দেখে "মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ"রূপ তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকার অনুসন্ধানে নির্গত হলেন এবং তদাবিষ্কারে স্বয়ং ধন্য হয়ে অপর সাধারণকে কৃতার্থ করলেন। সমাধি অবলম্বনে উপলব্ধি করলেন যে, মানব সাধারণের সসীম জ্ঞান ও চৈতন্য, দেশকালাতীত এক অসীম জ্ঞান চৈতন্যের আপেক্ষিক বিকাশ মাত্র এবং আরও উপলব্ধি করলেন যে, সেই জ্ঞান চৈতন্যের আরও নিম্ন ভূমির বিকাশ রয়েছে, গো মহিষাদি পশু সমূহে, তরু গুল্ম লতাদিতে এবং সব চাইতে জড় বলে যাদের সম্বন্ধে মানবের ধারণা, ধাতু-লোষ্ট্রাদি পদার্থনিচয়ে। অনন্তভাবে বিভক্ত

জগৎ তখন তাঁর চক্ষে এক নূতন আলোকে আলোকিত ও প্রতিভাসিত হল এবং 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' পদার্থের উপলব্ধি করে তিনি শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হলেন। কামকাঞ্চনপ্রসূত গাঢ় অমানিশার অন্ধকারে সংযতেন্দ্রিয় সুসারথি তিনিই একমাত্র জাগ্রত রইলেন এবং মোহমুগ্ধ অপর জনসাধারণকে জাগ্রত করবার জন্য অভয় আশ্বাসবাণী প্রদান করলেন! ইন্দ্রিয়াদির অতীত পদার্থ দর্শন করেই তিনি ঋষি হলেন এবং দেশকালাতীত পূর্ণানন্ত পরমধামের সাক্ষাৎ সত্য সংবাদ দেওয়াতেই তাঁর বাক্য বেদ অথবা ঐশ্বরিক জ্ঞান বলে প্রসিদ্ধ হল।

প্রশ্ন হতে পারে, সমাধি সহায়ে উপলব্ধ বিষয় যে মস্তিষ্কের ভ্রমমাত্র অথবা রোগ বিশেষ নহে, তার প্রমাণ কি? উত্তরে বলা যায়, সমাধি-লাভের পূর্ব্বে তোমার যেরূপ জ্ঞান, সংযম, ইচ্ছাশক্তি, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ছিল, সমাধিলাভের পর যদি সেই সকলের বিন্দুমাত্র হ্রাস না হয়ে শতগুণে বৃদ্ধি দেখতে পাও, তা হলে ঐ অবস্থাকে কি বলতে চাও? তারপর শান্তি—যে শান্তির জন্য নানা প্রকার অভাব পূরণের চেষ্টায় জনসাধারণ দিবা রাত্রি ছুটাছুটি করেও পূর্ণমাত্রায় কখন পাচ্ছে না, সেই শান্তি যদি তোমার

সদা সর্ব্বক্ষণ বিগুমান থাকে, তা হলে সে রোগ-বিশেষ যে প্রার্থনীয়!

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, বেদ পুরাণাদি জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ যেন কোন জিনিষের—যথা সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্নাদির—তালিকা বিশেষ। যদি তুমি সেই পদার্থের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত থাক, তা হলে মিলিয়ে নিতে পার, সেই পদার্থের কোন্ কোন্ রূপের সহিত তোমার পরিচয় হয়েছে এবং কোন্ কোন্ রূপের সহিত বা হয় নি। তখন যে যে রূপের উপলব্ধি হয় নি, তাদের যাতে উপলব্ধি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করতে পার। অতএব বেদ যে শুদ্ধ সমাধি অবস্থার উপলব্ধি সমূহ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করে জগৎপূজ্য হয়েছেন, তা নয়, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের নিম্নাৎ নিম্নস্তর হতে সর্ব্বোচ্চ স্তরের চরম সীমা নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত উঠবার কালে সাধক মানবের শরীর এবং মনে যেরূপ পরিবর্ত্তন, অনুভব এবং তৎফল স্বরূপ ধর্ম্মমত, আস্তিক্য ও বিশ্বাসাদি এসে উপস্থিত হয়, জগতের কল্যাণের জন্য তৎসমুদায়ও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে আমাদের লাভালাভ কি? মনুষ্য মাত্রকেই ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হতে গেলে ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক

বর্ত্তন, নানাপ্রকার মতে সত্য বলে বিশ্বাস, নানা-
ারের ধারণা, বহির্জ্জগতের নানাপ্রকার পদার্থ সাহায্যের
অবলম্বন প্রভৃতির ভেতর দিয়ে গমন করে নিত্য
ɾ পদার্থ লাভ করতে হবে। ভেতরের ও বাইরের
সকল পরিবর্ত্তন বৃক্ষবিশেষের প্রতি পত্রে রূপের
ব় প্রতি মানবের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন হলেও
ারণতঃ সর্ব্ব কালেই একরূপ থাকবে। কারণ, এই
ৃর নিয়ম—বহুর মধ্যে একের বিকাশ, একের
স্যূতত্তা—যা হতে মানবীয় সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান
ৎপর হয়েছে। অতএব তোমার অনুভূত বিষয়
লের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ অনুভূত এবং বেদাদি
গ্রন্থনিবদ্ধ অনুভবের যদি সমতা পেতে থাক, তা
ল নিঃসন্দিহান চিত্তে তুমি স্বীয় পথে অগ্রসর হয়ে
দেশ্য লাভে কৃতকৃতার্থ হবে।

ধর্ম্মপথে অগ্রসর হতে সাধকশরীরমনে যে কি
ামূল পরিবর্ত্তন এসে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয়, তা
র্ব্ব পূর্ব্ব বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষিগণ, ঐতিহাসিক
গের সিদ্ধ ও সাধকগণ এবং বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মবীর-
ণের জীবনী আলোচনায় বিশেষ উপলব্ধি হয়। নচি-
কতার যমসদনে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ, সত্যকাম
াবালের অগ্নি উপাসনার ফলে আচার্য্যত্ব প্রাপ্তি,

মিথিলাধিপতি জনকরাজের রাজ্যশাসন করতে করতে বিদেহত্ব বোধ ইত্যাদি, সিদ্ধপুরুষোপলব্ধ অনুভবের ভেতর অথবা পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্করের হৃদয়ে কিশোর কালেই অদ্বৈতবোধ স্ফূর্ত্তি এবং তৎপরে ধীরে ধীরে সেই জ্ঞান অপরকে প্রদান করবার শক্তি বিকাশ, মহামতি ঈশার চল্লিশ দিন উপবাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গয়াধামে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন হতে ধর্ম্ম শক্তি প্রকাশ এবং বর্ত্তমান-কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবশরীরে দ্বাদশবৎসর কঠোর তপস্যা-দির পর অদ্ভুত ধর্ম্মসমন্বয় শক্তি বিকাশাদির ভেতর তত্তৎ জগদ্‌গুরুর মহান্ হৃদয়ে কত দেবাসুরের সংগ্রাম ও জয় পরাজয়, কত উদ্যম আশা ও নিরাশা, কত আনন্দ ও বিরহ, কত যুগান্ত পরিবর্ত্তনের পর চিত্তের সমতাবস্থা লাভ এবং তৎসঙ্গে তত্তৎ দেবপ্রতিম শুদ্ধ সত্ত্ব শরীরে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছিল, তার ইতিহাসের কতটুকু আমরা পেয়েছি বা রাখতে পেরেছি? যতটুকু রাখতে পেরেছি তার জন্য, জগৎ আজ কত ধনী, কত ধন্য হয়েছে; আবার সেই ইতিহাসের অধিকাংশই কি ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থে নেই? জগৎ জুড়ে একটা রব উঠেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস পাওয়া যায় না, ইতিহাস লিখতে ভারতের লোক জানত না! আরে মূর্খ! রাম শ্যামকে মেরে রাজা হল, তৎপরে

মর দশটি সন্তান হল, তিনি বিশ বৎসর রাজত্ব
লেন অর্থাৎ কতকগুলি আইন চালালেন, কাকেও
স্কার এবং কাকেও বা দণ্ড দিলেন, খেলেন,
লন, বিবাদ করলেন, আনন্দ করলেন, কষ্ট
লেন এবং মরলেন—এই কি তোমার ইতিহাস?
ইতিহাস রইল বা না রইল, তাতে জগতের বিশেষ
ত বৃদ্ধি কি? কিন্তু ইতিহাস অর্থে যদি—যে সকল
াপুরুষের চিন্তাস্রোত সমগ্র দেশবাসীর মনের উপর
াধিপত্য করে তাদের নূতন ভাবে গড়েছে, যে
ব মহান্ হৃদয়ের ভালবাসা আপামর সাধারণ মানবকে
ঃস্বার্থ হতে শিখিয়েছে, যে সকল মহৎ চরিত্রের
াদর্শ দেশবাসীর চক্ষের ভেতর দিয়ে হৃদয়ের অন্তস্তলে
প্রবেশ করে প্রস্তরাঙ্কিত মূর্ত্তিবৎ চিরজাজ্বল্যমান
য়েছে—সেই সকল মহাপুরুষের প্রাণের উপলব্ধির
ইতিহাস হয়, তা হলে ভারতই যে তা বিশেষ
ভাবে রেখেছে। তা হতেই কি বর্ত্তমান যুগে
জাগতিক ধর্ম্মজ্ঞান বুঝবার বিশেষ সহায়তা হচ্ছে না?

উন্নতোদার চিন্তাতরঙ্গপরম্পরা হৃদয়ে ধারণ করতে করতে মানবশরীরমনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাতে আশ্চর্য্য নেই। বর্ত্তমান যুগের সকল পণ্ডিতেরাই উহা একবাক্যে বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞান

চর্চ্চা যতই অধিক হচ্ছে, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হচ্ছে, এবং তৎফলস্বরূপ জার্ম্মানি আমেরিকা প্রভৃতি দেশসমূহে অপূর্ব্ব অভিনব উপায়ে মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে। ইহার নাম পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান বা Experimental psychology. প্রত্যেক মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাবের এক এক শারীরিক অনুরূপ এবং প্রত্যেক শারীরিক পরিবর্ত্তনের সহিত চিরসম্বদ্ধ এক এক মানসিক প্রতিকৃতি বের করাই এর উদ্দেশ্য। একজন বন্ধু বলেছিলেন, ঔষধ, রাজনীতি এবং ধর্ম্ম, এদের মা বাপ নেই; বয়স হলে সকলেরই আপনা আপনি হয়, যত্ন করে শিক্ষা করতে হয় না। কোনস্থানে ঐ তিন বিষয় সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন যদি উপস্থিত হয়, ত সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই ঐ প্রশ্ন সিদ্ধান্ত করে দিতে অধীর হবে। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এতদিন ঠিক ঐরূপ ছিল—বিশেষতঃ অপরাপর দেশে। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা যতই দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে, ততই কল্পনার আলোকান্ধকারমিশ্রিত ভ্রান্তছায়া মনোবিজ্ঞানের অধিকার হতে দূরাপসৃত হয়ে মানসিক গঠন এবং কার্য্যপ্রণালীর যথাযথ তত্ত্বসমূহ যথার্থ আলোকে আলোকিত হচ্ছে এবং মনোবিজ্ঞান যথার্থ বিজ্ঞান-

বাচ্যত্ব লাভ করে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অন্যান্য শাস্ত্রনিচয়ের কক্ষ হচ্ছে।

প্রত্যেক মানসিক ভাবের এক একটি শারীরিক তিকৃতি আছে। আবার তদ্বিপরীত অর্থাৎ প্রত্যেক রীরিক পরিবর্ত্তন এক একটি মানসিক পরিবর্ত্তন পস্থিত করে, ইহাও সত্য। বহিঃস্থ শক্তিবিশেষ ক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় পথে পাঁচ প্রকারের শারীরিক রিবর্ত্তন উপস্থিত করাতেই ঐ সকলের মানসিক প্রতিকৃতিস্বরূপ রূপরসাদি পাঁচ প্রকারের জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। আবার বিষয়বিশেষে গাঢ় মনোনিবেশ করলে ঘর্ম্ম নিঃশ্বাসমান্দ্যাদি হওয়াও সকলের প্রত্যক্ষ। নিষ্ঠুর চিন্তাপরম্পরা সর্ব্বক্ষণ মনে জাগরূক থাকাতে চোর ঘাতকাদির বিকট মুখশ্রী এবং উদারভাবপ্রবাহ হৃদয়ে নিয়ত ধারণের ফলে সাধুর সৌম্যদর্শনাদিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা স্থূল স্থূল কতকগুলি পরিবর্ত্তনের কথাই এখানে উল্লেখ করলাম। নতুবা বহিঃশক্তি ইন্দ্রিয়পথে আঘাত করে স্নায়ুমণ্ডলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্পন্দিত করলে সমুদ্রাভিমুখী নদীসকলের ন্যায় স্নায়ুতরঙ্গ সকল মস্তিষ্কাভিমুখে গমন করে; এবং চন্দ্রমাতাড়িতসমুদ্রস্ফীতির তরঙ্গাকারে নদীগর্ভ প্রবেশের ন্যায়, আত্মতাড়িত অন্তঃকরণতরঙ্গনিচয় প্রথমে মস্তিষ্কে

প্রবেশ করে স্থূলতর রূপ ধারণ করে। তৎপরে স্নায়ুমণ্ডলে স্পন্দন উৎপন্ন করে স্নায়বিক তরঙ্গাকারে শরীরেন্দ্রিয়ে সঞ্চরণ করে বিভিন্ন-পদার্থবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মায়, ইত্যাদি অনেক কথা বলা যেতে পারত। স্নায়ুমণ্ডল এবং মস্তিষ্কের ঐ সকল তরঙ্গরাজি শারীর-বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। পাঠকের কৌতূহল হলে শারীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থে উহার অনুসন্ধান করতে পারেন। অন্তঃকরণতরঙ্গনিচয় আবিষ্কার করা এবং যথাযথ পাঠ করাই মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য প্রভৃতি মানবের সকল অবস্থাই ঐরূপে মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্ত্তনের ফলে অনুভূত হয়। মানব আপন বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা উন্নত বা অবনত যে অবস্থাতেই উপনীত হউক না কেন, উহা তার শরীর মনে পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন তরঙ্গ পরম্পরার ফলেই এসে উপস্থিত হবে, এ কথা নিশ্চিত। ঐ সকল পরিবর্ত্তনরাজির প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ হতে পারে। প্রথম,—যেগুলি আদর্শস্থানীয় আপ্ত পুরুষদিগের শরীর মনে অনুভূত হওয়াতে মানবমনের বিশেষ উন্নতির পরিচায়ক বলে স্থিরীকৃত হয়েছে, দ্বিতীয়,—যে গুলি জন-সাধারণের নিয়ত প্রত্যক্ষ বা অনায়াসপ্রত্যক্ষ হওয়ায়

াধারণ উন্নতির পরিচায়ক এবং তৃতীয়, যেগুলি রোগী,
দ্র্য, লম্পটাদি নিম্নস্থানীয় মানবশরীরমনে নিয়তানুভূত
ওয়াতে উহাদের নীচত্বপরিচায়ক। উহাদের মধ্যে
তীয়শ্রেণীভুক্ত পরিবর্ত্তনরাজি নির্ণয় করা শারীরবিজ্ঞানের
ষয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তগুলি আধুনিক ইউরোপীয় মনো-
জ্ঞানের অধিকারের ভেতর এবং প্রথম শ্রেণীভুক্ত-
লি বেদাদি জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থনিবদ্ধ দেখতে
াওয়া যায়। এর মধ্যে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের
কটু বিশেষত্ব আছে। উহা প্রথম শ্রেণীর পরিবর্ত্তন-
লিকে মনুষ্যোপলব্ধ নিত্য ঐশ্বরিক-জ্ঞান বলে এবং
প্রকার অবস্থা লাভ করাই, সমগ্র সৃষ্টি ও মানব
বিনের একমাত্র চরম লক্ষ্য বলে ধারণা করে
তীয় ও প্রথম শ্রেণীর কিয়দংশ-ভুক্ত পরিবর্ত্তনরাজি
থাযথ পাঠ করতে চেষ্টা করছে। ভারতের
ার্শনিক সেইজন্যই বেদনিবদ্ধ ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনরাজি
। অনুভব সমূহের ইতিহাসকে "পুরুষনিঃশ্বসিত,
াপ্তবাক্যাদি" নামে অভিহিত করেছেন। ভারতের
র্শন সেইজন্য সাধারণ মানবের উপলব্ধির উপর ভিত্তি-
্থাপন না করে জ্বলন্তমহিম মহাপুরুষদিগের উপলব্ধির
িপর ভিত্তিস্থাপন করে দণ্ডায়মান। ভারতের দর্শন
সইজন্য কেবল কল্পনানুমান সহায়ে রচিত না হয়ে

অন্যান্য দেশের দর্শনসমূহের ন্যায় প্রত্যক্ষীকৃত অনুভব-নিচয়ের উপরেই রচিত হয়েছে। ইউরোপীয় দার্শনিক ভারতের দর্শন সমূহ কল্পনানুমানপ্রসূত ইত্যাদি বলে যতই ঘৃণার চক্ষে দেখুন না কেন, উহা তাঁরই আপ্ত পুরুষের অবস্থাবিষয়ক অজ্ঞান এবং আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়ক মাত্র।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ধর্ম্মগ্রন্থসমূহনিবদ্ধ জগতের যাবতীয় ধর্ম্মবীরগণের অনুভব সমূহ অশেষ প্রকারে বিভিন্ন; ঐ সকলের ভেতর এমন কোন সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ সাধারণ ভূমি আছে কি, যার উপর মনোবিজ্ঞান ভিত্তি স্থাপন করে দণ্ডায়মান হতে পারে? বিভিন্নতার ভেতর একতা যতক্ষণ আবিষ্কৃত না হবে, ততক্ষণ কোন বিষয় বিজ্ঞানরাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী কেমন করে হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, নির্ব্বিকল্প সমাধি অনুভূত প্রত্যক্ষ এবং তাৎকালিক শরীরাবস্থান সর্ব্বকালে সর্ব্ব পুরুষের একরূপই হয়েছে, ইহা ধর্ম্মেতিহাসপ্রসিদ্ধ। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "যেমন সব শিয়ালের এক রা" (এক প্রকার আওয়াজ) সেইরূপ নির্ব্বিকল্প অবস্থায় অনুভূত বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় ঋষি এবং অবতারকুল এক কথাই বলে গেছেন। এখানে "নানা মুনির নানা মত" নেই। সকলের এক মত।

দক ঋষিগণ-সেবিত "মহাবাক্য চতুষ্টয়", অমিতাভ প্রচারিত "মহানির্ব্বাণাবস্থা," শিবাবতার শঙ্কর ষিত "সোঽহংজ্ঞানাবস্থান," মধুর বৃন্দারণ্যে মাধবপদে সর্গীকৃতসর্ব্বস্ব তন্ময়প্রাণা গোপীগণের আপনাতে কৃষ্ণবোধ, পিতৃভাবের জ্বলন্ত নিদর্শন মহাত্মা ঈশার ংপিতার সহিত একত্ববোধ ইত্যাদি সকলই উপাস্য ও াসকের মিলনসম্ভূত দ্বৈতবিবর্জ্জিত এক অবস্থাবিশেষ-ই যে লক্ষ্য করছে, ইহা স্পষ্ট। ঐ অবস্থাবিশেষ ক হলেও উহাতে উপনীত হবার পথ নানা। একথার াভাসও উদারচরিত বৈদিক ঋষিগণ এবং যাবতীয় বতারগণও দিয়ে গেছেন। যাস্ককৃত নিরুক্তে আপ্ত রুষ সম্বন্ধীয় আলোচনায় বলা হয়েছে যে, দ্বৈতবর্জ্জিত বস্থানুভব করে আপ্তত্ব লাভ, আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়-াতীয় পুরুষই নির্ব্বিশেষে করতে পারে।

আপ্তবাক্যের যথার্থ অর্থ কি, তা আমরা এতক্ষণে ঝলাম এবং ম্লেচ্ছজাতীয় পুরুষের বাক্যও যে বেদ লে গণ্য হতে পারে, তাও ঋষিগণ বলেছেন, দখলাম। আর একটি কথার সত্যতাও এখানে অনুমিত য় যে, নির্ব্বিকল্প অবস্থা ও উপলব্ধ বিষয় এক হলেও এতে উপনীত হবার পথের নানাত্ব ও ভিন্নত্ব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকবে। জগৎ কখনই একধর্ম্মমতাবলম্বী হবে

না, কিন্তু কালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রচারিত "যত মত তত পথ" বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করে পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব পরিত্যাগ করবে।

ভারতের দর্শন যেমন মহাপুরুষকুলের প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান, ধর্ম্মও তদ্রূপ। সেই জন্যই ভারতে দর্শন এবং ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ভূমি নির্দ্দিষ্ট হয় নি। ভারতের ঋষি ধর্ম্মকে সংসার হতে বিভিন্ন করে মানব উহা করলেও পারে, না করলেও পারে, এ ভাবে দেখেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম সমগ্র জগৎকে অধিকার করে রয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির চরমোদ্দেশ্যই ধর্ম্ম বা মুক্তিলাভ করা। প্রতি মানব নিজ জীবনে প্রতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে যে যে অনুভূতি করছে, সে সকল তাকে ঋজু কুটিল পথ দিয়ে ঐ উদ্দেশ্য লাভের দিকেই অগ্রসর করছে। ধর্ম্ম এক অবস্থাবিশেষ, মানবের সখের বিষয় নয়। ভাল মন্দ উভয় প্রকার কার্য্যের ভেতর দিয়ে, সুখ দুঃখ উভয় প্রকার কার্য্যের ভেতর দিয়ে, সুখ দুঃখ উভয় প্রকার অনুভবের ভেতর দিয়ে, আস্তিক্য নাস্তিক্য প্রভৃতি নানাবিধ বিশ্বাস ও ধারণার ভেতর দিয়ে অবশেষে চরমোন্নতির ফলরূপ মানবজীবনে ধর্ম্ম বা মুক্তি এসে উপস্থিত হয় এবং তখনই মানব নিজে ধন্য হয়ে জগৎ পবিত্র করে।

আপ্ত পুরুষের জীবনানুভব আলোচনায় যে বিশেষ ফল
হ, তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। জ্ঞান যে
য়েরই হউক না কেন, মানবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের
দংশ দগ্ধ করে দেয়। কারণ, সংস্কার বা পূর্ব্বানুষ্ঠিত
্যাসই মানবকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় এবং সংস্কারবিশেষের
পত্তি আবার বস্তুবিশেষের বিপরীত ধারণা হতে
ন্ম থাকে। সর্পের দংশনস্বভাব না জেনেই অজ্ঞ
লক সম্মুখস্থ সর্পধারণে সযত্ন হয়। ইন্দ্রিয়পঞ্চক এবং
নর সসীম স্বভাব না জানাতেই মানব এদের সহায়ে
ত্য সত্য উপলব্ধি করবার প্রয়াস করে। অবিমিশ্র
খ লাভ অসম্ভব না জেনেই আমরা এর অন্বেষণে
তত ছুটাছুটি করি। ইত্যাদি। অতএব সেই বিপরীত
রণার স্থানে সেই বস্তুবিষয়ক যথাযথ জ্ঞানের যদি
ানরূপে উদয় হয়, তা হলে সে সংস্কার এবং
ৎপ্রসূত পূর্ব্ব চেষ্টাদিরও যে নাশ হবে, এতে আর
ন্দেহ কি? এবং পূর্ণ জ্ঞানানুভবে যে সর্ব্বপ্রকার
ংস্কার এবং তৎপ্রসূত নিখিল কর্ম্ম সমূহের একান্ত নাশ
বে, এও স্পষ্ট। এজন্যই শ্রীভগবান্ গীতায়
লেছেন,—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমা-
্যতে"। অতএব "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ
িদ্যতে" মানবকে পবিত্র করতে জ্ঞানের সদৃশ দ্বিতীয়

বস্তু আর নেই। বস্তুবিষয়ক যথাযথ জ্ঞানই আবার মানুষকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন করে তোলে, এও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। মনে কর, চৌর-লম্পটাদির নীচপ্রবৃত্তিনিচয় তত্তৎ শরীর মনে কেন উপস্থিত হয়, এ বিষয়ের কারণানু-সন্ধানে তুমি নিযুক্ত হলে। প্রথমতঃ দেখলে যে, যে বিষয় নিয়ে তাদের ঐ সকল জঘন্য প্রবৃত্তির উদয় হয়, সেই সেই বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হবামাত্র তাদের শরীরস্থ বহিরন্তরবার্ত্তাবাহি-স্নায়ুসমূহ চির-অভ্যাস বশতঃ হৃদয়াদি শারীর যন্ত্রের ন্যায় মানসিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অপেক্ষা না রেখে আপনা আপনি স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তৎফল স্বরূপ, তারা তত্তৎ জঘন্য কার্য্য করতে যাচ্ছে, ইহা বিশেষরূপে জানবার পূর্ব্বেই ঐ সকল করে বসে। আরও দেখলে যে, তারা ঐ সকল কার্য্যই বিশেষ পুরুষত্বপরিচায়ক বলে অহঙ্কার করে থাকে এবং তত্তৎ কার্য্যানুষ্ঠানে বিশেষ আনন্দ লাভ হবে ধারণা করে আছে এবং পরিশেষে দেখলে যে, ঐ প্রকার ধারণা হতে তাদের তত্তৎ কার্য্য অকরণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ঐ সকল বিষয় বুঝামাত্রই তোমার বোধ হল যে, তাদের ঐ সকল কার্য্য ত্যাগ করাতে হলে তাদের বিপরীত অভ্যাস সমূহ করতে শরীরকে শেখাতে হবে। উহা করতে হলে

প্রথমতঃ তাদিগকে এমন স্থানে রাখতে হবে, যেথানে প্রলোভনের বিষয় সকল সহজে তাদের সম্মুখে উপস্থিত না হয়। তৎপরে তোমার বোধ হল যে, তাদের পূর্ব্বাভ্যাস, তত্তৎ কার্য্যসমূহ পুরুষত্ব-পরিচায়ক ও বিশেষ আনন্দজনক এই ধারণা হতেই উপস্থিত হয়েছে। তুমি দেখলে যে, তত্তৎ বস্তু-বিষয়ক ভুল ধারণা হতেই ঐ প্রকার কার্য্য করতে তারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেছে এবং এখনও করছে। অতএব উহাদিগকে ঐ সকল ত্যাগ করতে হলে পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল ভুল ধারণাস্থলে ঐ বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান যাতে আসে, তোমাকে তাই করতে হবে। মনে কর, ঐ সকল কার্য্যকরণে অবশ্যম্ভাবী দুঃখ সকল দেখিয়ে তুমি কালে তাদের ধারণাসমূহ পরিবর্ত্তন করতে পারলে। তা হলে তৎফলস্বরূপ তাদের ঐ সকল কার্য্যও যে কালে ত্যাগ হবে, সে বিষয় কি আর বুঝাতে হবে? বৃক্ষের প্রধান মূল ছিন্ন হলে উহার জীবন যেমন অসম্ভব, সেইরূপ ঐ মূল ধারণা ত্যাগে ঐ সকল কার্য্যের অস্তিত্বও নষ্ট হল। অতএব ঐ সকল নীচ মানবমনের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধীয় জ্ঞানই যে তোমায় ঐ সকল মন পরিবর্ত্তনের শক্তিসম্পন্ন করল, ইহা স্পষ্ট।

আপ্তপুরুষের অনুভব, স্বভাব ও চেষ্টাদির আলোচনাও আমাদিগকে ঠিক ঐ প্রকার শক্তি-সম্পন্ন করে এবং জগৎ ও মানব জীবন সম্বন্ধিনী কি প্রকার ধারণা হতে তাঁদের ঐ প্রকার নিঃস্বার্থ চেষ্টাদি হয়ে থাকে, তা বুঝিয়ে দেয়। অশান্তিপূর্ণ মানব জীবনে তাঁদের অপূর্ব্ব শান্তি এবং শোক, দুঃখ, আনন্দাদিতে অদ্ভুত অবিচলতা দেখে তদবস্থালাভে আমাদের অনুরাগী করে এবং তাঁদের জীবনের অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিপ্রকাশ, তাঁদের অবস্থা যে সাধারণ মানবের অবস্থা হতে অনেক উচ্চ ভূমির অবস্থা এ কথা বুঝিয়ে দিয়ে মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করে। তবে শ্রদ্ধার সহিত তাঁদের জীবন আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ, শ্রদ্ধাই কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। শ্রদ্ধাবিরহিত মন ঐ সকল বিষয় আলোচনা করবার কোন আবশ্যকতাই অনুভব করবে না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—শ্রদ্ধাবিরহিত সংশয়পূর্ণমন অজ্ঞান-মানব নষ্ট হয় অর্থাৎ সত্য লাভে সমর্থ হয় না। কারণ, শ্রদ্ধার অভাবেই নানাপ্রকার সন্দেহ এসে উপস্থিত হয় এবং মানবকে জ্ঞান লাভ করতে দেয় না।

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি কোন বিষয়ে সন্দেহ করব না? যে যা বলে, তাই চোখ্‌ কান বুজে বিশ্বাস করব? না, তা করতে হবে না। সত্য লাভ করব, এই দৃঢ় সংকল্প করে শ্রদ্ধার সহিত সকল বিষয় অনুশীলন কর এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণ-রূপে বুঝতে পার, সকল বিষয় পরীক্ষায় মিলিয়ে পাও, ততক্ষণ নানাপ্রকার প্রশ্ন ও চেষ্টাদি করো। উহাকে সংশয় বা সন্দেহ বলে না। পরীক্ষা না করেই কোন বিষয় মিথ্যা বলে ধারণা করা এবং অগ্রাহ্য করাই এস্থলে সংশয় শব্দের অর্থ। উহা না করলেই হল।

আর এক কথা, শাস্ত্র বলেন, আপ্তাবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করলে মানব জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে অতীন্দ্রিয় পদার্থের দর্শনে সমর্থ হয়—অপরের জানবার বিষয় নয়। উহা সর্ব্বতোভাবে স্বসংবেদ্য। যাঁর হয়েছে, তিনিই জানতে ও বুঝতে পারেন। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্র একথাও বলেন যে, আপ্তপুরুষের বাহ্যিক প্রকাশ দেখলে তাঁর উচ্চ প্রকৃতির বিষয় আমরা জানতে পারি এবং তাঁদের অনুভবাদির আলোচনাই যে অজ্ঞ মানবের তদবস্থা লাভের প্রধান সহায়, এ কথা পতঞ্জলি প্রভৃতি সমগ্র ঋষিকুল এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন। তবে

যতদিন না আমাদের তদবস্থা লাভ হবে, ততদিন যে আমরা তাঁদের মানসিক গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারব না, এ কথায় আর সন্দেহ কি?

শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধপ্রমুখ অবতার-কুলের জীবনানুভব আবার আপ্তপুরুষাপেক্ষাও সমধিক বিচিত্র এবং উচ্চ ভূমিকারূঢ়। তজ্জন্য তাঁদের চেষ্টাদিকে ঋষিগণ "লীলাবিলাসাদি" নামে এবং তচ্চেষ্টাদির অধিষ্ঠান ভূমি—তাঁদের শরীরেন্দ্রিয়াদিও শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণনির্ম্মিত বলে নির্দ্দেশ করেছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "যেমন খাদ না হলে গড়ন হয় না, অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি মূল্যবান্ ধাতু-নিচয়ে অলঙ্কারাদি গঠন করতে হলে তাতে তাম্রাদি নিকৃষ্ট ধাতু সকল মিশ্রিত করতে হয়, নতুবা গঠন টেকে না—সেইরূপ রজঃ ও তমোগুণের কিয়দংশ না থাকলে মনুষ্য শরীর হওয়া অসম্ভব।" অতএব অবতার শরীর গঠনে রজঃ তমোগুণ স্বল্প মাত্রায় বর্ত্তমান, ইহা সত্য। কিন্তু উহা এত অল্প যে, ঐ ভাগ লক্ষ্য না করে তাঁদের শরীর মনের চেষ্টাদি শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ প্রসূত বলতে পারা যায়।

আবহমানকাল ধরে মানব বিশ্বাস করেছে, অবতারকুল, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অংশ হতে উৎপন্ন

অতএব ঐশীশক্তিসম্পন্ন। তাঁরা মানব শরীর ধারণ করে ধর্ম্ম-জগতের চরম তত্ত্বে উপনীত হবার নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করে উহা উন্নতাবনত অবস্থাপন্ন সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্নপ্রকৃতি মানবের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে দেন। ঐ সকল নূতন পথাবিষ্কারে সবিশেষ শক্তির প্রয়োজন। তজ্জন্য তাঁদের শরীরেন্দ্রিয়াদির গঠনও তদুপযোগী হয়ে থাকে। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ও অনুভবাদিও উহাতে ধৃত এবং যথাযথ পঠিত হয়ে থাকে। তাঁদের সাধনোদ্যমাদিও অমানুষী চেষ্টাসম্পন্ন এবং জগতের কল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত। কারণ সংযম, প্রেম, মুক্তি বা মনুষ্যোপলব্ধ এমন কোন সদ্‌গুণই নেই, যা তাঁদের "অনবাপ্তমবাপ্তব্যম্"—লাভ হয় নি, অতএব লাভ করতে হবে। তত্রাচ তাঁরা ঐ প্রকার অদ্ভুত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে থাকেন। সাধারণ মানবের ত কথাই নেই, তাঁরা মনুষ্যশরীরে দেবপ্রতিম আপ্তপুরুষকুলেরও আদর্শস্থানীয়। আপ্ত-পুরুষেরা তাঁদের পদানুসরণ করেই আপ্তত্বাদি অবস্থা লাভ করে থাকেন। অথচ তাঁদের সমস্ত জীবনানুভব আপ্তপুরুষদিগেরও হয় না; কেন না, ধর্ম্মজগতের নূতন তত্ত্ব ও পথাদি আবিষ্করণ জন্য তাঁদের জন্ম গ্রহণ নয়। অতএব অবতার-কুলের

শরীর-মনের অনুভবাদি যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "সিদ্ধপুরুষ ও অবতারের প্রভেদ শক্তির বিকাশ লয়ে হয়ে থাকে; নতুবা নির্ব্বিকল্প সমাধিলব্ধ জ্ঞান উভয়ের এক রূপই হয়ে থাকে।" একজন মায়াপ্রসূত কামকাঞ্চনাদি হতে কোনরূপে আপনাকে বাঁচিয়ে মুক্তি লাভ করে প্রস্থান করেন; অপর জন অপরকে সাহায্য করবার নিমিত্ত বন্ধনের উপর বন্ধনাদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করে তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরও বন্ধন মোচন করে দেন এবং আপনার বন্ধনও ইচ্ছামাত্র মোচন করে ফেলেন! ভারতের পুরাণসমূহ আর কিছু করুক্ না করুক্, তাঁদের অনুভবাদির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করে মনুষ্যকে অমূল্য ধনে ধনী করেছে।

প্রত্যেক ঈশ্বরাবতার বা আপ্তপুরুষচরিত্র আমরা তিনভাবে আলোচনা করতে পারি। অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার চোখে তাঁদের কার্য্যকলাপাদি দেখে বা শুনে উহা ভণ্ডধূর্ত্তাদির মিথ্যাকল্পনা-প্রসূত বা মানবের রোগবিশেষ বলে বিশেষ অনুধাবন না করেই, একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি। অথবা বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রণোদিত হয়ে ঐ সকল পুরুষের মানবকুল

হতে সম্পূর্ণ জাতিগত পার্থক্য অনুমান করে তাঁদিগকে এক অপূর্ব্ব জীববিশেষ বলে ধারণা করতে পারি। অথবা তাঁদের অস্তিত্বে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে অসক্তবুদ্ধি সত্যানুসন্ধিৎসু দার্শনিকের চোখে তাঁদের কার্য্যকলাপাদির বিশেষ অনুধাবন ও পরীক্ষা করে তদ্বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভে কৃতার্থ হতে পারি।

প্রথম দৃষ্টি অবলম্বন করলে মানবের যাবতীয় ধর্ম্মেতিহাসই মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করতে হয় এবং মিথ্যা বিশ্বাসাদিও যেমন কখন কখন গৌণভাবে মানবের উপকারে এসেছে, যাবতীয় ধর্ম্মবিশ্বাসাদিও পূর্ব্ব যুগে সেই ভাবে মানবের উন্নতির সহায় হলেও এখন আর তাদের আবশ্যকতা নেই, ইহাই স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিতে ঐ সকল মহাপুরুষ উপলব্ধ অবস্থা ও অনুভবনিচয় তাঁদেরই একায়ত্ত সম্পত্তিবিশেষ বলে স্থির করতে হয় এবং উহা মানব সাধারণের জীবনে কখনই অনুভূত হবার নয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় এবং ভক্তিলাভের উপায়মাত্রভিন্ন অন্য কোন কারণে তদালোচনার নিষ্ফলতা প্রমাণ করে অথবা তাঁদিগকে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ জীববিশেষ বলে ধারণা করে মানবকে কেবলই তাঁদের কৃপাপ্রার্থী

হয়ে থাকতে শিক্ষা দেয়। কিংবা ক্রোধনস্বভাব দণ্ডদাতা উৎকোচগ্রাহী দেবতাবিশেষ বলে ধারণা করিয়ে সকাম মানবকে দুর্ব্বলতার পথে দিন দিন অগ্রসর করে।

তৃতীয় দৃষ্টিতে তাঁদিগকে, অসাধারণ হলেও, মানব বলে সিদ্ধান্ত করে তাঁদের অনুভবাদি প্রত্যেক মানবের মহামূল্য জীবনাধিকারসম্পত্তি বলে নির্দ্ধারিত করে তাঁদিগকে বিশেষরূপে আপনার করে মানবকে আশা ভরসা এবং বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন করে। তাঁদের উচ্চগতি দেখে মানব আপনার উচ্চগতিতে বিশ্বাসবান্ হয় এবং সেও সেই বংশপ্রসূত অতএব সকল ধনের অধিকারী বলে আত্মনিহিত শক্তিতে নির্ভর করে দাঁড়াতে শেখে। এই দৃষ্টি অবলম্বনে মহাপুরুষ চরিত্রালোচনার ইচ্ছা বারান্তরে রইল। এখন ভাগীরথীনিষেবিত পঞ্চবটীতলে যাঁর অলৌকিক জীবন বেদাগম-পুরাণাদি জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থনিবদ্ধ সমগ্র অবতার-কুলেরও অনুভবাদি অতিক্রম করে উচ্চতর ভূমিকায় আরোহণ করেছিল, যাঁর অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশের আরম্ভমাত্র দেখে জগৎ স্তম্ভিত হয়েছে, যাঁর অপূর্ব্ব জীবনালোক কালরাত্রির ঘনান্ধ-ক্রোড়ে লুক্কায়িতপ্রায় বেদাদির অর্থবোধে বাসনাপ্রাণ ভোগলোলুপ বর্ত্তমান কালের

মানবের একমাত্র সহায়, কামকাঞ্চনপূতিগন্ধপূর্ণ শোক-দুঃখময় স্বার্থপর সংসারে "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" যাঁর বার বার আগমন, উদ্বোধন, এস, আমরা ধর্ম্মতনুজগদ্‌গুরু সেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকা মস্তকে ধারণ করে তাঁরই জীবনানুভব সময়ে সময়ে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করি এবং ধন্য হই।